বিজ্ঞান মেলা

ছোটদের জন্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পাক্ষিক বিজ্ঞান পত্রিকা

ফেব্রুয়ারী ১৯৮০
মাঘ ১৩৮৯
দু' টাকা পঁচিশ পয়সা

বিজ্ঞান মেলা এই সংখ্যায়...

মাছেরা কি শব্দ শোনে?
মানুষ কি আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবে?
হার্ট কেন আওয়াজ করে?
ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট টেলিভিসন আবিষ্কারের গল্প
এ সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে ধারাবাহিক সায়েন্স ফিকসন্ 'সে আসছে!'

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

শুভারম্ভ জুলাই ১৯৮৩

অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা
পরিচালিত

শ্রীরামপুর স্টাডি সার্কেল

কে, এম, সাহা ষ্ট্রীট. শ্রীরামপুর

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী কোর্স স্নাতোকোত্তর, প্রাইভেট, রেগুলার

যে কোন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের যোগাযোগ করিবার স্থান

শ্রীঅলক কুমার বাগ পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক
শ্রীরামপুর নন্দলাল ইনষ্টিটিউশন
চাতরা, শ্রীরামপুর

শ্রীস্বপন কুমার চ্যাটার্জ্জী রসায়ণ বিভাগের শিক্ষক
শ্রীরামপুর নন্দলাল ইনষ্টিটিউশন
চাতরা, শ্রীরামপুর

কলিকাতায় যোগাযোগ করিবার স্থান

শ্রীঅমল কুমার ঘোষ
জয়মালা ২৯/২, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— অভিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত বিভাগ ও কলাকেন্দ্র

যোগাযোগের স্থান **শ্রীমতী অপর্ণা বাগ**
২৭, বাজার লেন, শ্রীরামপুর (ঝাউতলার নিকট)

বিজ্ঞান মেলা—বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক বিজ্ঞান-পত্রিকা। সি. এস. আই. আর, কর্তৃক স্বীকৃত একমাত্র বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা।

△

সম্পাদক

অমিত চক্রবর্তী

সুভাষ সান্যাল

△

সম্পাদকীয় দপ্তর

৫৩ সি, মতিলাল নেহেরু রোড,
কোলকাতা-৭০০ ০২৯
ফোন—৪৭-৬৯৮০

△

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা
২৪ টাকা (সডাক)

অসীম চক্রবর্তী কর্তৃক ১৭৩, অশোকগড় কোলকাতা-৭০০ ০৩৫ থেকে প্রকাশিত এবং এলম্ প্রেস, ৬৩, বিডন ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

বিজ্ঞান মেলা

ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ * ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা * মাঘ ১৩৮৯

সায়েন্স ফিক্‌সন্

গ্রীণ থাম্‌ব্ / ক্লীফোর্ড সীম্যাক্ ৫৭

সে আসছে / হীরেন চট্টোপাধ্যায় ৭২ / ৮১ / ৭৩ / ৭৪

জ্ঞান-বিজ্ঞান

মানুষ কি আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবে ? / শংকর চক্রবর্ত্তী ৬১

হাতিয়ার থেকে যন্ত্র / মির্জা নৌশাদ ৬৪

সূর্য্যস্থির পৃথিবীই ঘুরছে / বিশ্বজিৎ দাস ৭৫

বিশ্বজুড়ে বিচিত্র প্রাণ / ৯৬

আবিষ্কারের পিছনে

টেলিভিশন / সুনীল সরকার ৭৫

অনুবাদ

পরমাণু শক্তির গল্প / লরা ফের্মি ৭৮

নিয়মিত বিভাগ

বিজ্ঞানের খবর / ৫২

ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট / ৮২

মনের জানালা / ৯৪

শরীর-স্বাস্থ্য / ৮৬

অবিশ্বাস্য ! / ৮৮

জানো কি ? / ৯৮

ধাঁধা / ৯৮

যা নিয়ে এখন হৈ হৈ / ৫৫

জেনে রাখা ভাল / ৫৩

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ / প্রদীপ বিশ্বাস

খবর

(১) পুরণো বইয়ে নতুন চমক

আমাদের সকলেরই বইয়ের সাথে অল্পবিস্তর বন্ধুত্ব আছে—তাই না ? আর পুরণো বইয়ের পাতা ওল্টাতে গিয়ে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ একটু অসাবধান হলেই পাতাগুলো অল্প একটু টানেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। আসল ব্যাপারটা কি জান, এই বইয়ের পাতা তৈরী হয় অ্যাসিডে ডোবানো কাঠের মণ্ড থেকে। অ্যাসিডের উপস্থিতিতে কাগজের মধ্যেকার জলীয় বাষ্পের কণারা পাতার সেলুলোজের সাথে বিক্রিয়া করে সেগুলোকে স্রেফ মুচ্‌মুচে করে দেয়। আমেরিকার গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞরা এই অসুবিধা এড়াবার জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতিতে পুরণো বইগুলো একটা শূন্য ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তার মধ্য থেকে পাম্প করে বাতাস বের করে নেওয়া হয়। বাতাসের সাথে বইগুলো থেকে বেরিয়ে আসে বেশ কিছু পরিমাণে জল। এরপর বই থেকে অ্যাসিড তাড়াবার জন্য ঐ ঘরে পাম্প করে পাঠানো হয় ডাই ইথাইল জিঙ্ক গ্যাস। এবার ঐ গ্যাসটাকে বের করে নিয়ে যদি ঘরে আবার বাতাস ঢুকতে দেওয়া হয় তবে ঐ অবস্থায় বইগুলোই শূন্যঘর থেকে বের করে এনে কি দেখা গেছে জান ? তাদের পাতা অত সহজে ছিঁড়ে যায় না।

(২) ড্রসোফিলার-ব্যাপার স্যাপার

তোমরা তো সবলেই ফল খাও কিন্তু কখনও কাটাফল বা পচা ফল, লক্ষ্য করে দেখেছ কি ? যদি লক্ষ্য করে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই ছোট ছোট মশার মতো এক ধরনের পতঙ্গকে উড়তে দেখেছ। এদের চলতি নাম Fruit fly আর ভালো নাম ড্রসোফিলা। এই ছোট ছোট পতঙ্গগুলোর বুদ্ধির বহর শুনলে তোমরাও একটু চমকে উঠবে। অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী জে. জি. ওকেসেটি ও তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন এই ড্রসোফিলার বিভিন্ন প্রজাতি ভিন্ন জাতীয় খাবার খায় খাদ্যসমস্যা এড়াবার জন্য। আমাদের যেমন খাবারে নানারকম বাছবিচার আছে তেমনি এদের বিভিন্ন প্রজাতি তাদের খাবার ঠিক করে সেই খাবারে কতটা অ্যালকোহল আছে তার উপর নির্ভর করে। এদের কেউ কেউ পছন্দ করে খুব বেশি অ্যালকোহল-যুক্ত পচে যাওয়া আঙুর বা নাসপাতি। যারা আঙুর বা নাসপাতির ভক্ত তাদের দেহে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেস নামে একটা এনজাইম তৈরী হয় তা এই বিষাক্ত ইথানলের বিষক্রিয়া নষ্ট করে দেয়। আবার এদের কেউ পছন্দ করে খুব কম অ্যালকোহল-যুক্ত পচে যাওয়া সব্জি টমাটো, শশা আবার কারও বা পছন্দ মাঝারি অ্যালকোহলযুক্ত তরমুজ জাতীয় খাবার। আমরাও যদি ড্রসোকিলাদের মত এক এক ধরনের খাবারে অভ্যস্ত হতে পারতাম তবে আমাদের খাদ্য-সমস্যা কত সহজ হয়ে যেত বলো তো ?

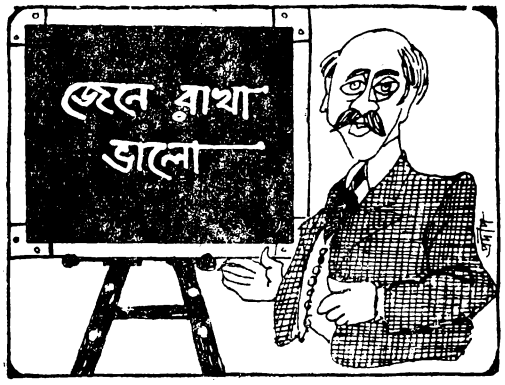

(১) **নদীর মাছ সমুদ্রে বাঁচে না কেন ?**

নদীর মাছ সমুদ্রে ছেড়ে দিলে তা বাঁচবে না প্রধানতঃ সমুদ্রের নোনা জলের জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হোল সমুদ্রের মাছ বা অন্যান্য প্রাণী তো ওই নোনা জল খেয়েই বেঁচে থাকে। কিন্তু সমুদ্রের নোনা জল খাবার ফলে সামুদ্রিক মাছেদের শরীরে যে বাড়তি নুনটা জমা হয়—সেই নুনটা একটা বিশেষ উপায়ে তার শরীর থেকে বার করে দেবার ব্যবস্থা আছে। ওদের ফুলকা বা মুখগহ্বরের মধ্যে অথবা শরীরের অন্য কোনও স্থানে থাকে বিশেষ এক ধরণের কোষ—যা নুন ক্ষরণ করে। কিন্তু নদীর মাছে এই বিশেষ ক্ষমতা নেই। উল্টে তাদের শরীরে অন্য একধরণের কোষ আছে যা কি না নদীর জল থেকে নুন শোষণ করে। ফলে নদীর মাছ সমুদ্রে ছাড়লে অতিরিক্ত নুনের জন্যই তা মারা যাবে।

(২) **ডুমুর ফুল কি ?**

কথায় বলে ডুমুরের ফুল অর্থাৎ যা কি না দেখা যায় না। ডুমুরের ফুল দেখা যায় না—এই ধারণাটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। ডুমুরের ফল বলে আমরা যা জানি তাই আসলে ডুমুর ফুল। ডুমুর ফলটাকে আধখানা করে কেটে আতস কাঁচ দিয়ে দেখলে তার মধ্যে অসংখ্য ফুলের কুঁড়ির মতো জিনিস দেখা যায়। ইংরাজীতে এগুলোকে বলে florets। Florets আসলে হল ছোট ছোট ফুল। এই ছোট ছোট ফুলগুলো দিয়েই তৈরী হয় সম্পূর্ণ ডুমুর ফল।

(৩) **জন্মের পরেই শিশুকে কাঁদানোটা দরকার কেন ?**

শিশু ভূমিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ওঠে আর তার ফলে মুখ গহ্বর দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে তার শ্বাসক্রিয়া চালু করে। সেইজন্য জন্মের পর শিশু না কাঁদলে তাকে জোর করে কাঁদানো হয়। এমন কি কোন কোন সময় শিশুর মুখগহ্বরের মিউকাসে হাত দিয়ে পরিস্কার করে ডাক্তার বা নার্সরা নিজের মুখ শিশুর মুখে রেখে জোরে ফু দিয়েও শিশুর শ্বাসকার্য শুরু করান।

(৪) **উল্কা জিনিষটা কি ?**

উল্কা হোল পৃথিবীর বাইরে থেকে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূ পৃষ্ঠে এসে পড়া লোহা বা পাথরখণ্ড। কোন কোন বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে উল্কা হোল ভেঙে যাওয়া গ্রহ বা উপগ্রহের টুকরো। সাধারণতঃ নভেম্বর মাসে যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে তখন রাত্রিবেলা খালিচোখেই এগুলো দেখা যায়। উল্কা সাধারণতঃ তিন প্রকারের—(১) সাইডেরাইট বা লোহা যার 74% ধাতু, (২) সাইডেরোলাইট বা পাথুরে লোহা যার 50% ধাতু, 50% সিলিকেট,

(৩) এয়ারোলাইট বা পাথুরে লোহা। এই প্রসংগে বলা যেতে পারে পৃথিবীর গড় উপাদান উল্কার গড় উপাদানের মতোই।

(৫) **অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র কিভাবে কাজ করে?**

আমরা জানি কার্বণ ডাই অক্সাইড গ্যাসের মধ্যে আগুণ জ্বলে না। তাই অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রে এই কার্বণ ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরীর ব্যবস্থা আছে যা দিয়ে আগুণ নেভানো যায়। এই যন্ত্রটি একটি ধাতু নির্মিত সিলিণ্ডার। এর মধ্যে থাকে সোডিয়াম কার্বনেট বা সোডার দ্রবণ (Na_2CO_3) আর সেই দ্রবণের মাঝে বসানো থাকে সালফিউরিক অ্যাসিড ভরা একটি কাঁচের বোতল। যন্ত্রটির হাতলে চাপ দিলে কাঁচের বোতলটিকে ভেঙে দেয়। ফলে সালফিউরিক অ্যাসিড সোডার সঙ্গে মিশে বিক্রিয়া শুরু করে খুব তাড়াতাড়ি কার্বণ ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। য়েই গ্যাস সিলিণ্ডারের সরু মুখ দিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে আসে। হঠাৎ আগুণ লেগে গেলে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের হাতলে চাপ দিয়ে এভাবে আগুণ নেভানো হয়।

(৬) **শুষ্ক বরফ কি?**

শূন্যডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এবং চল্লিশ অ্যাটমসফেরিক প্রেসারে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে তরল করা যায়। এই তরল কার্বণ ডাই-অক্সাইডকে একটি লোহার সিলিণ্ডারে ভরে এবং সেই সিলিণ্ডারের মুখ একটি ফানেলের ব্যাগ দিয়ে বেঁধে যদি সেই তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বাষ্পায়িত করা হয়, তবে তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড বরফের আকৃতিতে ওই ব্যাগের মধ্যে জমে ওঠে। এরকম জমানো কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বলে শুষ্ক বরফ।

জীবাণু সার

অ্যাজোটোবেকটার

জমির উর্বরতা ও ফলন বাড়ায়, গাছ দ্রুত বাড়ে, ঝাঁকড়া হয় ও সতেজ থাকে, ফুল ও ফলের আকার বড় হয়, দানা পুষ্ট হয়, গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ছত্রাক-রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়, জমির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ে।

রাইজোবিয়াম

বাদাম, সয়াবীন ও সমস্ত ডালচাষে 'রাইজোবিয়াম' জীবাণুসার ব্যবহার করুন। রাইজোবিয়াম ফলন বাড়ায় এবং পরবর্ত্তী ফসলের জন্য প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন জমিতে সঞ্চিত রাখে।

প্রস্তুতকারক : **নাইট্রোফিক্স ইণ্ডাষ্ট্রীজ**

(ভারত সরকার অনুমোদিত)

ব্লক ডি, জয়শ্রী পার্ক কলিকাতা-৭০০০৩৪

ফোন : ৭৭-৩৩২৬, ৭৭-১৪৯০

আলিপুর চিড়িয়াখানার উল্টোদিকে অডিও-ভিসুয়াল সেন্টারে জানুয়ারীর শেষের দিকে এক ছিমছাম্ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গল।

যা নিয়ে এখন হৈ চৈ

১৯৮৩ — আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বর্ষ

তোমরা বোধহয় শুনেছ, পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষ এ বছরটাকে পালন করেছে **'আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বর্ষ'** হিসেবে। 'যোগাযোগ' বলতে — মানুষে মানুষে জ্ঞান আর বার্তার আদান প্রদান, মনের ভাব বিনিময়। সেদিক থেকে — এ বছরটাকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বর্ষ হিসেবে পালনের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগকে সহজতর এবং দ্রুততর করা।

'যোগাযোগে'র ব্যাপারটা ভাবতে বসে সবচেয়ে আগে মনে আসছে যোহান গুটেনবার্গের নাম। জার্মানীর মাইন্‌জ্‌ শহরের ঐ স্বর্ণকারই প্রথম শক্করধাতুর সাহায্যে বানিয়েছিলেন লেখার হরফ; ছাপার কেস-এ লেখার হরফ গুলোকে পরপর সাজিয়ে ১৯৪৫ সালের যে দিন প্রথম 'বাইবেল' ছাপালেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের বিপ্লব ঘটে গেল সেদিন। মুদ্রণযন্ত্র মানুষের জ্ঞানকে ব্যক্তিবিশেষের মণিকোঠা থেকে বে'র করে ছড়িয়ে দিল সকলের মাঝে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুটেনবার্গের পরই যে স্যামুয়েল মর্স'র নাম — বিদ্যুৎ চুম্বকের সাহায্যে তারের মধ্যে দিয়ে বাল্টিমোর থেকে ওয়াশিংটনে খবর পাঠালেন তিনি। পৃথিবীতে টেলিগ্রাফ মারফৎ যোগাযোগের সেই প্রথম দিনটির তারিখ ২৪শে মে, ১৮৪৪। অল্পদিনের মধ্যেই টরে টক্কা যন্ত্র বসে গেল দেশে দেশে; কিন্তু তারের মধ্যে দিয়ে সংকেত পাঠিয়েই তো মানুষ সন্তুষ্ট নয়, সরাসরি কথাও বলতে চায় দূরের মানুষের সঙ্গে। সেই ব্যাপারটাকেই সম্ভব করলেন আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল— ১৮৭৬ সালের ৭ই মার্চ টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে তিনি কথা বললেন সহকারী ওয়াটসনের সঙ্গে।

মজার কথা, গুটেনবার্গের ছাপার যন্ত্র সাধারণ মানুষকে যেভাবে আকর্ষন করেছিল, মর্স-এর টেলিগ্রাফ যেমন অল্পসময়ের মধ্যেই পৃথিবীর বহু দেশে ছড়িয়ে পড়িয়েছিল, গ্রাহাম বেল-এর টেলিফোনের বেলায় কিন্তু তেমনটা হয় নি। টেলিফোন আবিষ্কারের পর মজার মজার কার্টুন বেরতো খবরের কাগজে। ঐ সব কার্টুনের মধ্যে দিয়ে দেখানো হত—টেলিফোনের উপদ্রবে মানুষ কিভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠছে। আবার কখনও ব্যঙ্গচিত্রে দেখানো হত — মানুষ যেমনভাবে টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে অন্য লোকের কথা শুনতে পায় তেমনি ঘরে বসে যেন আয়নায় দূরের লোকেদের দেখতে পাচ্ছে। ব্যাপারটা তখনকার দিনে ব্যঙ্গ হলেও — মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে বাস্তবে রূপ পেয়েছিল টেলিভিসনের মধ্যে দিয়ে।

যোগাযোগের এরপর বলতে হয় ফটোগ্রাফীর প্রসংগে। ক্যামেরার সাহায্যে পৃথিবীতে প্রথম ছবি তোলেন ফরাসী

বিজ্ঞানী — জোসেফ নিপ্‌বস্‌ — ১৮২৬ সালের সালের কথা সেটা। প্রথম দিকে ছবি তোলার ব্যাপারটা ছিল ভারী খটমট ; কারোর ছবি তুলতে হলে ঘাড়ে ক্ল্যাম্প্‌ লাগিয়ে তাকে ঠায় বসিয়ে রাখা হত পাঁচ-সাত মিনিট। তাছাড়া — ক্যামেরা দিয়ে ফটো তোলার চেয়ে কোনও শিল্পীকে ডেকে নিজের এক তৈলচিত্র আঁকিয়ে নেওয়াটাকেও অনেকে আভিজাত্যপূর্ণ বলে মনে করতেন। সত্যি কথা বলতে, গেলে ক্যামেরা আবিষ্কারের সত্তর আশি বছর পর ক্যামেরা এবং ছবি তোলার বাকী সাজ সরঞ্জামের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ লোকেদের মধ্যে ছবি তোলার ব্যাপারে তেমন কোনও আগ্রহ দেখা যায় নি। এর ঠিক উল্টো ব্যাপারটাই ঘটেছিল সিনেমার ক্ষেত্রে। দিনটা ছিল ১৮৯৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী। ঐ একই দিনে রবার্ট পল লণ্ডনে আর লুমিয়ের ভাইএর প্যারিসে দেখালেন তাঁদের তৈরী প্রথম চলচ্চিত্র এবং রাতারাতি তা এত জনপ্রিয় হ'ল যে রবার্ট পল তো ধরেই নিলেন — লোকেদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একদিন চলচ্চিত্রই সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেবে। রবার্ট পল যখন শিক্ষামূলক ছবি তৈরী করছেন তখন লুমিয়ের ভাইএরা এমন সব সিনেমা করছেন যা লোকের মনোরঞ্জন করে। তবে সেই সঙ্গে সিনেমার অনেক উন্নতিও করেছেন ওঁরা। যাই হোক, ১৯১০ সালের একদিন রবার্ট পল বুঝতে পারলেন—শিক্ষা বিস্তারের বদলে মানুষকে অবসর সময়ে আনন্দ দেওয়ার ব্যাপারে চলচ্চিত্র-কারদের আগ্রহটা অনেক বেশী। রাগে দুঃখে সেদিন রাত্রেই তিনি পুড়িয়ে দিলেন তাঁর চলচ্চিত্রের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম।

এবার আসি বেতার আর টেলিভিসনের কথায়। আচার্য জগদীশচন্দ্র কলকাতাতেই প্রথম অতিক্ষুদ্র তরঙ্গে বেতারে সংকেত পাঠালেও, ঘটনাক্রমে সে কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। বেতারের অধিকর্তা হিসেবে যারা পৃথিবীর মানুষ আজ চেনে ইটালীর গুলমিকো মার্কনীকে। ১৯২৫ সালে টেলিভিসন আবিষ্কারের চল্লিশ বছরের মধ্যে মানুষ পৃথিবীতে বসেই চন্দ্র অভিযানের ছবি দেখেছে সরাসরি টেলিভিসনের মাধ্যমে। গত ২০ বছরে ভূ-সমলয় উপগ্রহগুলি যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। নিমেষের মধ্যে এক দেশের মানুষ অন্য দেশের খবর জানতে পারছে, এক দেশের খেলা অন্য দেশে বসে টেলিভিসনে দেখতে পারছে যোগাযোগ উপগ্রহগুলির কেরামতীতে। এই মুহূর্তে আমেরিকার 'ইন্‌টেলস্যাট' নামে তিনখানা উপগ্রহের আওতায় রয়েছে গোটা পৃথিবীটা। তোমাদের হয়তো ইন্‌স্যাটের কথাও মনে পড়বে। ভারতের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ 'ইনস্যাট্‌-১এ' ঘটনাচক্রে বিকল হয়ে গেলেও আর কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা পাব 'ইন্‌স্যাট্‌-১বি'কে—যা হয়তো আমাদের টেলিফোন ব্যবস্থা আর বেতার-টিভি'র অনুষ্ঠান প্রচারে দারুণ কাজে আসবে। যোগাযোগ উপগ্রহগুলিকে দিয়ে আরও নিখুঁতভাবে এবং তাড়াতাড়ি কাজ করানোর জন্য এখন কম্‌পিউটারের ব্যবহার হচ্ছে এবং 'অপটি-ক্যাল ফাইবার' আর লেসার রশ্মির সাহায্য নেওয়ার কথাটাও ভাবা হচ্ছে। মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার ব্যবহার শুরু করেছিল। ভাবলে অবাক লাগে—মানুষে মানুষে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাধাটাই এসেছে—কিন্তু ঐ ভাষার কাছ থেকেই। যত দেশ তত ভাষা, যত উপজাতি তত উপভাষা। গত হাজার হাজার বছরেও পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বোধগম্য একটা সার্বজনীন ভাষা চালু হল না। চেষ্টা যে হয়নি তা নয় ; এসপেরান্টো' নামে একটা ভাষা তৈরী করেছেন আমাদের বিশেষজ্ঞরা—যে ভাষা নাকি সবচেয়ে সহজে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়া যায়। কিন্তু ঐ যে বললাম তাও আদতে জনপ্রিয় হল না। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বর্ষে আমাদের এই ব্যর্থতার কথাটা কিন্তু ভুললে চলবে না!

ধারাবাহিক সায়েন্স ফিকশন

গ্রীন থামব

ক্লিফোর্ড সিম্যাক

আগে যা ঘটেছে :—[ভিন্‌গ্রহে থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী এসেছে আমার বাগানে। প্রাণীটির আকার পৃথিবীর একটা বড়সড় আগাছার মত। ষ্টিভেন্‌স্‌-এর বাগানে আট সারি গর্ত দেখলাম—আগাছাদের মাটি থেকে উপড়ে নিলে ঠিক যে রকম গর্ত হয়। তাহলে, আমার বাগানের ভিন্‌গ্রহী অতিথির নিশ্চয়ই আরো সঙ্গী ছিল; কোথায় গেল তারা ?]

বাড়ী এসে যেখানটায় গাছটাকে রেখেছিলাম সেখানে গেলাম। যে গামলায় কাটা মাটি আর জল রেখেছিলাম তা ঠিক তেমনিই পড়ে আছে—গাছটাই উধাও! বারান্দা, উঠোন আর বাগানটায় আলো জ্বেলে খুঁজলাম—শেষে বাড়ীর সদরের দিক্‌টায় এসে দেখি—জানলার উপর উঠেছে ওটা। জানলার গায়ে আমার বাহারী ফুলের গাছগুলোর কি করুণ অবস্থা! আমি বিস্ময়ে হতবাক। গাছটা না হয় চলতে ফিরতে পারে, কিন্তু তাই বলে উঠোনের দিকের দরজায় তালা খুলে সদরের দিকে আসে কি করে ? ঋজু, সতেজ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল গাছটা—কি দারুণ চনমনে আর প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল ওকে। জানলার সামনে দাঁড়াতেই গাছটা একটু নুয়ে পড়ে একটা শাখা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে তারপর ঠিক যেমন ভাবে বন্ধুর পিঠে হাত দিয়ে আলতো করে চাপড় মারি ঠিক তেমনিই গাছের ডালটাও বারকয়েক স্পর্শ করল আমায়। আমার হঠাৎ মনে হল : ভিন্‌গ্রহের এই বুদ্ধিমান প্রাণীটি মোটেই ভয়ঙ্কর কিছু নয়, বরং আপাততঃ আমার সঙ্গে ও বন্ধুত্ব করতেই আগ্রহী। সুতরাং আমার বাগানে ওকে অনায়াসে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। আর যদি তেমন কিছু বিগড়-বাই করে—তবে রাসায়নিক সার আর আর্সেনিক তো রয়েছেই। আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমতে চললাম।

পরের দিনটায় সারাক্ষণই ব্যস্ততায় কেটেছে—সন্ধ্যেবেলা গাছটার কথা মনে পড়ল। বাগানে যেখানে লেটুস্‌ গাছগুলো রয়েছে সেখানেই দেখতে পেলাম গাছটাকে। যথারীতি আশপাশের খানকয়েক লেটুস গাছ মরে পড়ে রয়েছে। গাছটা কি তাহলে কোনও অজ্ঞাত বিষ ছড়িয়ে আশপাশের গাছগুলোকে মেরে ফেলছে যাতে ওর জমিতে কেউ ভাগ না বসায় ? এরকম একটা সম্ভাবনার কথা আমার মনে হচ্ছিল। গাছটা বোধহয় আমাকে দেখেই চিনতে পারল। স্পষ্ট দেখলাম—গাছের ডালপালাগুলো নড়ে উঠল, যদিও একটুও হাওয়া ছিল না তখন।

রাতের খাওয়ার পর বাইরে বেরতেই দেখি পাঁচিলের গায়ে আমার বাগানের অতিথির মত দেখতে গোটাকয়েক আগাছা মরে পড়ে আছে। আমার প্রতিবেশীর বাগানের দরজাতেও কয়েকটা মৃত আরও আগাছার সন্ধান মিলল। আমার প্রতিবেশীটি যে তাঁর বাগানে রাসায়নিক সার ছড়িয়ে রাখেন তা আমি জানতাম। নিশ্চয়ই ঐ রাসায়নিক বিষেই গাছগুলোর মৃত্যু ঘটেছে। তবে কি ভিন্‌গ্রহ থেকে আসা বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে মাত্র একটাই বেঁচে আছে এবং সেটা আপাততঃ রয়েছে আমার বাগানেই।

আমার নিজের বাড়ীর দিকে ফিরে আসতে দেখি—ডাস্টবিনটার ধারে দাঁড়িয়ে সেই কুকুরটা বিরক্তিকর

ভাবে আবর্জনা ঘাঁটছে; বহুদিন কুকুরটাকে ইঁট ছুঁড়ে মেরেছি, কিন্তু লাভ হয়নি কিছু। ওটা ফিরে ফিরে প্রতিরাত্রে আসবেই।

ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ পরে খেয়াল নেই, আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল কুকুরের আর্ত চিতকারে। জানলা খুলে দেখি—কুকুরটা প্রাণপনে ছুটছে—আর পেছন পেছন তাড়া করে চলেছে আমার বাগানের ভিন্‌গ্রহী অতিথি। একটা ডাল দিয়ে সে আঁকড়ে ধরেছে কুকুরটার লেজ।

কুকুরটা যে আবর্জনা ছড়িয়ে আমাকে বিরক্ত করে তা কি আমার অতিথি বুঝতে পেরেছে? আর তাই কি ওকে আশ্রয় দেবার প্রতিদানে ও কুকুরটার উপদ্রব বন্ধ করে আমার উপকার করতে চাইছে? আমার হঠাৎ মনে হ'ল—আমি এবং গাছটা বোধ হয় পরস্পরকে খানিকটা বুঝতে পেরেছি।

পরের দিন সকালেই আমার প্রতিবেশী এসে হাজির। আমাকে দেখেই হেসে বললেন—জানেন, জেনি বলছিল আপনার বাগানে নাকি একটা গাছকে ও চলে ফিরে বেড়াতে দেখেছে। কি মজার মজার কথাই না বলতে পারে বাচ্চারা!

বুঝলাম, নেহাৎ বাচ্চা বলেই জেনি'র কথাকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আমাকে তো এবার সাবধান হতে হবে। প্রতিবেশী ভদ্রলোক চলে যেতেই বাগানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখতে পেয়ে গাছটা তার শিকড়গুলোয় ভর দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আগের ডালপাতাগুলো আলতো করে বুলিয়ে দিল আমার গা'য়। আমরা দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। আর গাছটা যে আশ্রয় পাওয়ার জন্য আমার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞ বোধ করছে সে ব্যাপারে আমার আর বিন্দুমাত্র সংশয় রইল না।

ফিরে যাচ্ছিল গাছটা, আমি হঠাৎ বলে ফেললাম —অ্যাই শোন। এবং শুনতে যতই অবাক লাগুক, গাছটা আমার ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর একটা মানুষ যেমন পিছুডাক শুনে ফিরে আসে, ঠিক তেমনি গাছটা আস্তে আস্তে ফিরে এল আমার কাছে। ভিন্‌গ্রহের ঐ প্রাণীটি কি তাহলে মানুষের ভাষা বোঝে? দূরে রাস্তার ও পাশে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়েছিল—আঙুল তুলে তাদের দেখালাম গাছটাকে। মুখেও বললাম, আকারে ইঙ্গিতেও বোঝালাম—আমাদের পৃথিবীর গাছপালা কেমন মাটি আঁকড়ে স্থির হয়ে থাকে। বাগানে ওর চলাফেরা বাচ্চাদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করবে, ও ধরা পড়ে যাবে। গাছটা যেন বুঝল আমার কথা। তারপর আস্তে আস্তে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে এগিয়ে চলল বাগানের পরিত্যক্ত গ্রীণ হাউসটার দিকে। বছর দশেক আগে অর্কিড রাখব বলে সখ করে বানিয়েছিলাম ওটা। অর্কিড টর্কিড অবশ্য আনা হয় নি, ঘরটা খালিই পড়ে আছে। ঐ গ্রীণ হাউসে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়াল গাছটা। আমি বললাম, সেই ভালো। দিনের বেলাটায় তুমি বরং এখানেই থেক। রাত্রে বাগানে ঘুরে বেড়ালেও কেউ টের পাবে না— অবশ্য পূর্ণিমার রাতে সাবধান! গাছটা বুঝল আমার কথা, সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল।

বস্তুতঃ গাছটাকে নিয়ে আর কোনও সমস্যাই রইল না এরপর। আমি অবশ্য প্রায়ই ভাবতাম— ভিন্‌গ্রহের এই প্রাণীটি তার সঙ্গীদের নিয়ে পৃথিবীতে এল কেন? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, স্কিনারের বাগানে প্রথম দিন যে বিশাল গহ্বর দেখেছিলাম সেখানেই এসে নেমেছিল ভিন্‌গ্রহের মহাকাশযান। কিন্তু ফিরে যাবার সময় কেন তা ফেলে রেখে গেল তার আরোহীদের? না কি আমার অতিথি তার মৃত

সঙ্গীদের নিয়ে চুপি চুপি নেমে পড়েছিল মহাকাশযান থেকে ? কিন্তু কেন ? কিসের আশায় ওরা থেকে গেছে ওদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিপজ্জনক এক গ্রহে ? মহাকাশযানের বাকী আরোহীরা কি তাদের হারানো সঙ্গীদের ভুলে গেল, খোঁজ করল না আর তাদের ?

দিন কয়েক কাটল গাছটাকে নিয়ে। অবসর সময়ে আমরা পাশাপাশি বসি, আমাদের পৃথিবীর পশুপাখি, গাছপালা আর মানুষের কথা ওকে বলি। একদিন একটা ইলেকট্রিক মোটরের কলকব্জা খুলে আবার তা এক এক করে জুড়লাম ওর সামনে বসে। ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম—কিভাবে বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করি আমরা। ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারটা অবশ্য আমি নিজেই ভাল জানি না—এবং গাছটাও আমার কথা শুনে বৈদ্যুতিক মোটর সম্পর্কে বিশেষ কিছু বুঝেছে - এমনটা অবশ্য আমারও কল্পনায় ছিল না। আমার বক্তৃতা শেষ হবার পরেই গাছটা কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে। মোটরের কলকব্জাগুলো ঝট্‌পট্ খুলে ফেলল, আর পরক্ষণেই নিপুন ভাবে জুড়ে দিল তা। সুইচ্ দিয়ে দেখলাম -দিব্যি চলছে মোটরটা।

এরপর আমার অতিথিকে একটা অপেক্ষাকৃত সোজা কাজ শেখানোর কথা ভাবলাম আমি। বাগানে কাঠের তক্তা পড়েছিল—সেগুলো দেখেই হঠাৎ আমার মাথায় আইডিয়া এল, ঐ তক্তাগুলো দিয়ে তো পাখীর খাঁচা বানানো যায়। খাঁচার মাপে তক্তাগুলোকে করাত দিয়ে কাটতে বললাম আমি। গাছটা শান্ত হয়ে আমার কাজ দেখছিল ; কেন জানিনা আমার মনে হ'ল—গাছটার দৃষ্টিটা যেন ভারি বিষণ্ণ। ওর চোখে এইরকম বিষণ্ণ দৃষ্টি দেখেছিলাম আর একদিন—যে দিন ওর সামনে আমি ফুল তুলছিলাম আমার বাগান থেকে। সেদিনও এমন করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ও। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন মনে হ'ল—আমার অতিথি ভিন্‌গ্রহের প্রাণী হলেও এখানকার গাছপালারা তো ওরই স্বজাতি। সেই গাছ থেকে তক্তা বানাতে কিংবা ফুল ছিঁড়তে দেখলে ওর তো কষ্ট হবেই। ও তো দেখছে—পৃথিবী নামের গ্রহটিতে আমরা মানুষরা বনের গাছপালা কেটে নষ্ট করছি, খাবার দাবার, পোষাকআসাক, আসবাবপত্র—সব তো আসছে ঐ গাছপালা থেকেই। আমাদেরই কি ভাল লাগবে যদি কোনও গ্রহে গিয়ে দেখি—সে গ্রহের অধিবাসীরা আমাদের মত আকৃতির কোনও জীবকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে!

এক একবার আমার মনে হতো—আমার অতিথিকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজ্ঞানীদের কাছে যাই। কিন্তু আমি তো মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, মফঃস্বলের মানুষ -রাজধানীর বিজ্ঞানীদের কাউকে চিনি না—কার কাছে নিয়ে যাব সেটা ভেবে ঠিক করতে পারি নি।

মাঝে মাঝে আমরা বাগানে চুপচাপ বসে থাকতাম। একদিন দেখি আমার অতিথির সামনে একটা লতানে গাছ নেতিয়ে পড়ে রয়েছে। করুণ ভঙ্গীতে গাছটার দিকে তাকিয়েছিল ভিন্‌গ্রহের প্রাণীটি। আমারও ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল ; লতানে গাছটার জন্য আমারও কষ্ট হচ্ছিল খুব॥ একসময় হঠাৎ দেখি -মৃতপ্রায় লতানে গাছটা কেমন সতেজ সজীব হয়ে উঠেছে !

সত্যি বলছি, ব্যাপারটা নিয়ে তারপর আমি দিনরাত ভেবেছি। মৃতপ্রায় গাছটার জন্য যেই আমার মনে বেদনাবোধ জেগে উঠল, অমনি শুধুমাত্র আমার সহানুভূতিটুকু পেয়েই গাছটা বেঁচে উঠল—এটা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য ? একবার মনে হ'ল—

ব্যাপারটা আবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। আমার উঠোনের পাশেই রয়েছে একটা হলুদ গোলাপের গাছ। এমন রুগ্ন গাছ পৃথিবীতে আর একটা আছে কি না সন্দেহ। ক'বছর ধরে গাছটার পরিচর্যা কম করা হয় নি। কিন্তু হলে কি হবে—গাছটার যেন বেঁচে থাকবারই উৎসাহ নেই ; কখনও ভাল করে ফুল পর্যন্ত ফোটে নি ওতে। আগের ঘটনাটার দিন চার পাঁচ পরে আমার অতিথিকে এড়িয়ে দাঁড়ালাম গোলাপ গাছটার সামনে। হতশ্রী চেহারারার গাছটার সামনে থাকাটাই এক বিড়ম্বনা, তা সত্ত্বেও মনে মনে আমি গাছটার প্রতি দয়ালু হতে চাইলাম, ওটা আর পাঁচটা গাছের মত সতেজ হয়ে উঠুক সেটাই কামনা করলাম। দিন সাতেক পর পর গাছটার সামনে দাড়িয়ে ওর সমৃদ্ধি কামনা করতে করতে একসময় দেখি—কখন যেন গাছটার ফুল পাতা এমনকি কাঁটাওয়ালা ডাল-গুলোকেও মনেপ্রাণে ভালবেসে ফেলেছি। এরও দিন চার-পাঁচ পরে অনুভব করলাম—আস্তে আস্তে হলেও গোলাপ গাছটার মধ্যে একটা পরিবর্তন হচ্ছে। ক্রমে গাছের পাতাগুলো সব ঝরে গিয়ে নতুন পাত গজালো—তেমন ঝক্‌মকে সবুজ পাতা আর হয় না তারপর সেই গাছে কুঁড়ি এল, ফুল ফুটল চারদিক আলো করে।.....

আমার অতিথির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ক্রমেই বাড়ছিল। যখন দুজনে মুখোমুখি বসে থাকতাম, এক-একসময় ওকে আমার গাছ বলে মনে হত না। ভাবতাম—ও বুঝি পৃথিবীরই আর এক অঞ্চলের মানুষ—যার আবেগ অনুভূতি আমার মতই—শুধু পরস্পরের ভাষাতে আমরা কথা বলতে পারি না।

শরতের মাসগুলো কেটে যাবার পর যখন হিমেল বাতাস বইতে শুরু করল—অমনি হঠাৎ খেয়াল হ'ল শীত আসছে। অতিরিক্ত শীতে যদি আমার বন্ধু কাবু হয়ে পড়ে সেই চিন্তাই আমাকে ঘিরে ধরে। এই রকমই এক রাত্রে আমরা দু জনে বাড়ীর পেছনের উঠোনে বসে ঝিঁ ঝিঁপোকার ডাক শুনছি—হাল্কা মহাকাশযানটা নজরে পড়ল আমার। বাগানের গাছ-গুলোর মাথায় নিঃশব্দে কখন যে নেমে এসেছে টেরই পাই নি। আস্তে আস্তে যানটা এসে নামল বাগানের লাগোয়া ছোট্ট মাঠটায়। কেন জানি না—আমি কিন্তু একটুও অবাক হই নি। হয়তো অব-চেতন মনে আমি আশা করতাম—ওর সঙ্গীরা নিশ্চয়ই ওর খোঁজে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে। মহাকাশযানের গা' বেয়ে তিনটে গাছ নেমে এল—আমার অতিথির স্বজাতি বলে চিনতে অসুবিধে হয় না। ওরা এগিয়ে আসছিল আমাদের দিকেই—আমার বন্ধুটি আমাকে এক বিশেষ ভঙ্গীতে আল্‌তো করে জড়িয়ে রইল। আমি বুঝলাম, ও আমাকে সুখ আর ভালবাসার কথা বলতে চাইছে। বাকী তিনটে গাছ ততক্ষণে আমার বন্ধুর পাশে এসে দাড়িয়েছে। বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ হ'ল—আগাছার মত দেখতে ভিন্‌গ্রহের বাসিন্দারা যে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে সেটা বুঝতে আমার কষ্ট হ'ল না। একটু পরেই ওরা সবাই মিলে ফিরল আমার দিকে, শেষ বারের মত ডালপালা নুইয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ওরা ফিরে গেল ওদের যানের দিকে।

.....আমার অতিথি চলে গেছে অনেকক্ষণ। ভিন্‌গ্রহের অতিথি আমায় শিখিয়ে গেছে—আবেগ অনুভূতি অভিমান ভালবাসা—সব কিছুর দিক থেকে আমাদের সঙ্গে গাছপালার কত মিল!

* সুতপা চক্রবর্তী

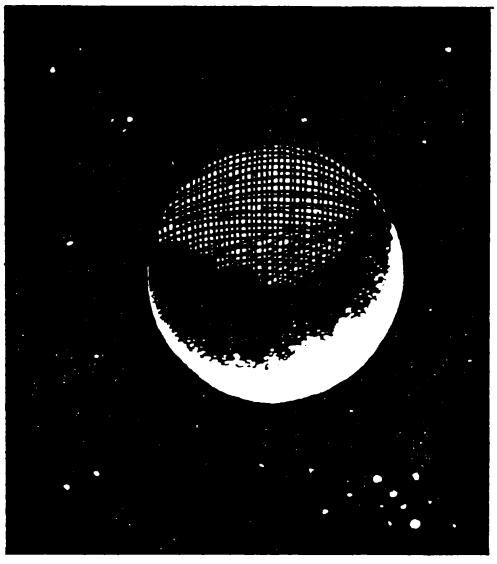

মানুষ কি আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবে ?

প্রকৃতির রাজত্বে আমরা বাস করি। প্রকৃতির বুকে অনেক ঘটনারই সঠিক বৈজ্ঞানিক চিত্রটি আজও কিন্তু আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় নি। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের আলোচনা। আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস এখনো পর্যন্ত আমরা অনেক সময়েই করে উঠতে পারি না। অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর গুরুত্ব হল অপরিসীম, বিশেষ করে সাগরের উপকূলবাসী মানুষ, সাগরের বুকে চলাচলকারী জাহাজ ও বিমান এই তথ্যের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

বায়ুমণ্ডলের প্রথম স্তরটির নাম হল ট্রপোসফিয়ার। বাতাস, মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি — আবহাওয়া তৈরীর গোটা কারখানাটাই হল এখানে। একটি আবহাওয়া ষ্টেশন ১০ কিলোমিটার পরিমিত একটি জায়গার আবহাওয়ার তথ্য সঠিকভাবে জানাতে পারে। পর্যবেক্ষণ বিমানের ক্ষেত্রে এই এলাকার পরিমাণ দাঁড়াবে ৮০ থেকে ৪০০ বর্গ কিলোমিটারের মত। একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে আবহাওয়া পরিমাপের যন্ত্রপাতি বসিয়ে তাকে পৃথিবী পরিক্রমার কাজে লাগিয়ে দিলে ঐ স্বয়ংক্রিয় সন্ধানী যন্ত্র ও ক্যামেরার নাগালের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ৮,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ধরা পড়বে। যন্ত্রগুলি যে সব প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে, কৃত্রিম উপগ্রহ কোন গ্রাহক ষ্টেশনের উপর দিয়ে যাবার সময় সেই তথ্যগুলোকে বেতার তরঙ্গে রূপে পালটে ওর হাতে তুলে যাচ্ছে। সেই তথ্যগুলো সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষিত হচ্ছে এবং মূল কেন্দ্রে পৌছে যাচ্ছে।

আজকাল সাগরের বুকে ঝড় দানা বাঁধবার আগেই আবহাওয়া নির্ণয়কারী কৃত্রিম উপগ্রহ তার ছবি তুলে আমাদের কাছে পৌছে দিচ্ছে। আরবের মরুভূমির ওপর ধূলোর ঝড়ের ছবি, মধ্য এশিয়ার ওপর দিয়ে পঙ্গপালের উড়ে আসার ছবি, মেরুঅঞ্চলে হিম শৈল ভেঙ্গে পড়ার ছবি এবং ভারতের দিকে মেঘের দলসমেত মৌসুমী বায়ুর এগিয়ে আসার ছবিও আবহাওয়া নির্ণয়কারী কৃত্রিম উপগ্রহদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি।

আবহাওয়াকে কি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর ? মানুষের কাছে এ তো এক বিরাট স্বপ্ন। যেখানে অনাবৃষ্টি ঘটছে সেখানে প্রয়োজনমতো বৃষ্টিপাত ঘটানো, অতিবৃষ্টিকে ঠেকানো, মরুদেশ ও সাগরের ঝড়ঝঞ্ঝা, তুফানকে সামলানো এ কি সত্যিই একদিন সম্ভবপর হবে ? বিশেষজ্ঞেরা এব্যাপারে একেবারে প্রাথমিক স্তরে কিছু কিছু পরীক্ষাকাজ শুরু করেছেন, যা থেকে এখনো কিন্তু বড় কোন সিদ্ধান্তে পৌছনো যাচ্ছে না। কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত ঘটানোর ব্যাপারটাই ধরা যাক। গত শতাব্দীর শেষের দিকেই পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছিল যে বায়ুমণ্ডলে কিছু বস্তুকণিকাকে যদি ছেড়ে দেয়া যায়, যাদের প্রকৃতি হচ্ছে hygroscopic অর্থাৎ বাতাস থেকে যারা জলীয় বাষ্পকে শোষণ করতে পারে, তাহলে ওদের চারপাশে জলীয় বাষ্পের

ঘনীভবনের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

১৯৪৬ সালে বিজ্ঞানী স্কেফার জানালেন, অতিশীতল মেঘেদের স্তরে বরফের কণাদের গঠন যে তাপ-মাত্রায় শুরু হয়, তা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে কি জাতীয় কণিকার চারপাশে ঘনীভবনের কাজ শুরু হচ্ছে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী ল্যাংমুইর ও স্কেফার কৃত্রিমভাবে বরফের কণা গঠনের পরীক্ষায় হাত দিলেন। জমাটবাধা কার্বন ডাই-অক্সাইডরূপী শুকনো বরফের খণ্ডদের বিমান থেকে ষ্ট্র্যাটাস মেঘেদের স্তরের মধ্যে ছুঁড়ে মারা হল। এই খণ্ডগুলো যখন নিচের দিকে নেমে আসে, তখন চার পাশের বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে অতি ক্ষুদ্র বরফের কেলাস বা ক্রিষ্ট্যাল গঠনের কাজ বিস্তৃতভাবে শুরু হয়ে যায়। দানারূপী ছোট বরফের কেলাসের চারপাশে আরো বড় কেলাস তৈরির কাজ এরপরে চলতে থাকে দ্রুতগতিতে।

১৯৪৭ সালে বিজ্ঞানী ভানগুই সিলভার আয়োডাইডকে বরফের কেলাস গঠনের কেন্দ্রক হিসেবে ব্যবহারের পরীক্ষা শুরু করলেন। দেখা গেল, বস্তুটিকে মেঘেদের স্তরের মধ্যে ছুঁড়ে মারার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বরফের কেলাসের গঠনকাজ শুরু হয়ে যায়। পরীক্ষা শুরুর ২০ থেকে ২৫ মিনিটের মধ্যে মেঘেদের নিচের স্তর থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং ৬০ থেকে ৮০ মিনিট পর্য্যন্ত বৃষ্টির ধারাবর্ষণ চলতে থাকে। একটা মোটামুটি হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, ১০ থেকে ২০ গ্রাম সিলভার আয়োডাইডের সাহায্যে মেঘেদের স্তরের মধ্যে বরফের কেলাস ঘনীভবনের মধ্য দিয়ে প্রায় দশলক্ষ টনের মত বৃষ্টির ধারাবর্ষণ ঘটতে পারে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় বছর কুড়ি আগে কলকাতা শহরের কিছু অঞ্চলের ওপর কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত ঘটানোর পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। এ জাতীয় পরীক্ষার কাজ অর্থনৈতিক বিচারে কতটা কার্য্যকরী হবে তা এখনো সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। কোন একটি স্থানের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের মাত্রা যদি কৃত্রিম প্রচেষ্টায় শতকরা ১০ থেকে পনের ভাগের মতও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, বিশেষজ্ঞেরা যে মাত্রাকে অদূরভবিষ্যতে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভবপর বলে মনে করছেন, তাহলেও খরচার অংকটা এখনো পর্যন্ত ফলপ্রাপ্তির বিচারে আকাশচুম্বী বলে মনে হতে পারে। তাই এজাতীয় পরীক্ষাকাজে আরো বেশ কিছুদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের ওপরেই বিশেষজ্ঞেরা বেশি গুরুত্ব আরোপ করছেন। কৃত্রিমভাবে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে খরা পারস্থিতি অথবা বন্যার সম্ভাবনাকে কিন্তু কখনোই ঠেকানো যাবে না। তবে শস্যের বৃদ্ধির সময় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ শতকরা দশ থেকে পনের ভাগের মত বাড়াতে পারলেও ফলন বৃদ্ধি পাবে বিশেষভাবেই। তেমনি শিলা-বৃষ্টিকেও যদি সময়মত ঠেকানো যায়, তাহলে তা কৃষির পক্ষে খুবই উপকারী হয়ে দেখা দেবে।

বিজ্ঞানীরা মহাদেশ ও মহাসাগরের ওপর ঝড়ঝঞ্ঝা তুফানকে নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন দেখছেন। এইসব প্রাকৃতিক তাণ্ডবের পরিমাণ যদি শতকরা দশ থেকে পনের ভাগও কমানো যায়, তাহলে মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমবে প্রায় শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ। বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলছেন আগামী ২০০০ সালের আগে এজাতীয় বড় পরীক্ষাকাজে হাত দেবার মত সামর্থ্য তারা অর্জন করে উঠতে পারবেন না। কারণ এখনো পর্যন্ত কিন্তু তাদের সঠিকভাবে জানা নেই হারিকেনরূপী একটি সামুদ্রিক ঝড় কি কার্য-কারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় বা একটি ঝড় গড়ে ওঠবার আগেই কোন্ অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণে আবার তা মিলিয়ে যায়।

বিমানবন্দরে ঘন কুয়াসা অনেক সময়ে দুর্ঘটনাকে ডেকে আনে। তাই সদাব্যস্ত বিমানবন্দরগুলোতে কুয়াসা দূরী-করণের কাজে বিশেষজ্ঞদের হাত লাগাতে হয়েছে এবং অনেক সময়েই তাঁরা সাফল্য অর্জন করে থাকেন। এজাতীয় আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণরূপী কাজের অর্থনৈতিক উপকারিতাও অপরিসীম।

একটি এলাকার আবহাওয়ার প্রকৃতি নির্বাচন বা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অরণ্যের ভূমিকা কতটা, এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা মত রয়েছে। আমরা জানি

অরণ্যের চারপাশের পরিবেশ আর্দ্র থাকে এবং তা হয়তো ঐ অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণকেও কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে। দুর্গাপুরের গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে এককালে যে বিশাল অরণ্য ছিল, তার প্রভাবে কলকাতার বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণের মধ্যে একটি সমতা রক্ষা পেত বলে কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন। নির্বিচারে গাছপালা কেটে ফেলার ফলে পশ্চিমবাংলার মোট অরণ্যের পরিমাণ বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা মাত্র তেরভাগে এসে দাঁড়িয়েছে এবং এখানে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত কমার মূলে একে একটি কারণ হিসেবে হয়তো চিহ্নিত করা যায়। আবহাওয়ার প্রকৃতিকে কিছুটা পরিমাণেও নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছপালা এবং অরণ্যসম্পদকে বাড়ানোর কাজটা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ তার বসবাসের ঘরবাড়ীর মধ্যেকার যে আবহাওয়া-রূপী পরিবেশ বা microclimate, তার আভ্যন্তরীন তাপ-মাত্রাকে কমিয়ে বাড়িয়ে বা সেখানে বায়ুসঞ্চালনের ব্যবস্থা করে নানাধরণের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে সে সূচিত করছে। একটি বড় জনবহুল শহর তার ওপরকার বায়ুস্রোতের গতি, তাপমাত্রা এবং পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। বায়ুমণ্ডল হল প্রকৃতির রাজ্যে একটি বিশাল সম্পদ বা সংস্থান, যার আভ্যন্তরীন বিভিন্ন শক্তিব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক বা ভারসাম্যের ব্যাপারটা আজও কিন্তু আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে পরিস্ফুট নয়। কৃত্রিমভাবে এই সব শক্তিব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বা ওদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এমন কোন বিপর্যয়কে ঘনিয়ে তুলব না তো, যার চেহারাটা হয়তো আমাদের কাছে এখনো অপরিজ্ঞাত — পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এধরণের একটি সাবধানবাণী কিন্তু বারেবারেই উচ্চারণ করছেন। তাই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের যে কোন কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপ দেবার ক্ষেত্রে আমাদের যে খুব সাবধানে এগুতে হবে, একথা অনস্বীকার্য।

শংকর চক্রবর্ত্তী

বিজ্ঞানমেলার তরফ থেকে

একৃষ্ণা ঘোষাল স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা

রচনার বিষয় : **প্রাণীজগতের বিচিত্র আচার আচরণ**

প্রথম পুরস্কার : ২৫ টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার : ১৫ টাকা

তৃতীয় পুরস্কার : ১০ টাকা

১৮ বছর বয়সের মধ্যে যে কোনও প্রতিযোগী এতে যোগ দিতে পারে। রচনার শব্দসংখ্যা ২৫০এর মধ্যে হওয়া চাই।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : ১৫ই মার্চ ১৯৮৩

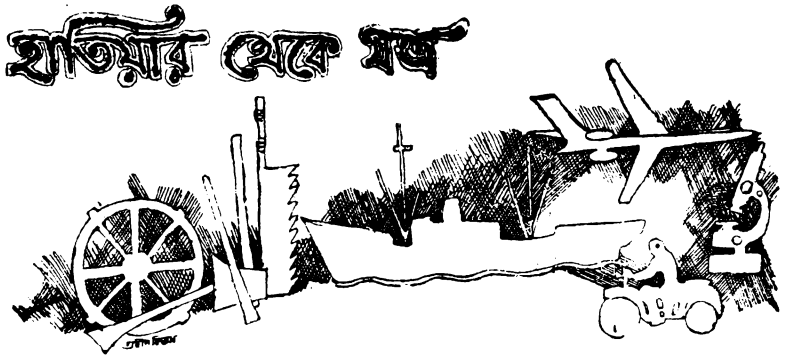

হাতিয়ার থেকে যন্ত্র

বড়দিনের উপহার

ইংলণ্ডের হাত থেকে বড়দিনের শ্রেষ্ঠতম উপহারটি পেল বিজ্ঞানজগৎ ;— ১৬৪২ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে স্যার আইজাক নিউটনের জন্ম হলো ! আবার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বড়দিনের উপহার — সেও এল ইংলণ্ডের কাছ থেকে, ১৮২১ সালে ! তবে সে উপহার দেবার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় ;— ১৮০০ সালের ২০শে মার্চ যেদিন ভোল্টা তৈরী করলেন পাইল — যা হলো ইলেকট্রিক ব্যাটারির শৈশব রূপ।

ঘসাঘসির স্থির বিদ্যুৎ থেকে একলাফে আসা গেল চলবিদ্যুতের রাজত্বে। এই রাজ্যে ঘসটানি নেই — শুধু কেমিক্যাল সেলের দুই ধাতুর ইলেকট্রোডে তার জুড়লেই বিদ্যুৎ পাওয়া যায় — সে বিদ্যুৎ দূরে যেতে পারে। পাইপের মধ্য দিয়ে যেমন জল যায়, সেই জলের প্রবাহ যেমন চাপের উপর নির্ভর করে ; আবার পাইপের মধ্যে বাধা যেমন চাপ কমায়, প্রবাহ বেগ কমায় — সেই একই রীতি দেখা গেল বিদ্যুতের ব্যাপারে। ব্যাটারি-সেলের ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে বিদ্যুতের প্রবাহ। আবার এই প্রবাহে বাধা তুললে বাধা কাটানোর চেষ্টার ফলে প্রবাহটির বইবার ক্ষমতার হ্রাস হয়। এ সব দেখলেন ১৮০১ সালে লণ্ডনে নিকলসন আর কার্লাইল। জলের সঙ্গে মিল টেনে তাঁরা বিদ্যুতের প্রবাহের নানা কাজের অংশের নামকরণ করলেন — কারেন্ট বা স্রোত, রেজিস্টেন্স বা বাধা এবং পোটেনশিয়াল বা ক্ষমতা। ঐশ্বর্যবান লোকের ক্ষমতা যেমন বিষয় বৈভবের উপর নির্ভর করে, বিদ্যুতের স্রোত-প্রবাহের ক্ষমতাও নির্ভর করবে পাইলের নিজস্ব অন্তর্নিহিত কেমিক্যাল ঐশ্বর্য-বিভবের উপর। এই বিভব বা ক্ষমতা অথবা পোটেনশিয়াল যেন জলের চাপ। আবার এই হলো ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স — বিদ্যুৎ পরিচলনের ক্ষমতা।

আবিষ্কারের পর থেকে শুরু হলো সেলের উন্নতির চেষ্টা। ভোল্টার পাইল নানা রূপান্তরের পথে ঘুরেফিরে নানা সেলে এমনকি ড্রাই ব্যাটারিতেও সেজে দাঁড়ায়। সেই সঙ্গে চলে বিদ্যুৎ নিয়ে ভাবনা চিন্তা। আর শুরু হয় বিদ্যুতের ব্যবহার। এই ব্যবহারটার সার্থক উপস্থিতি ঘটলো কয়লা মজদুর-মাইনারদের বন্ধু স্যার হামফ্রি ডেভির হাতে, সেই ১৮০১ সালে। ১৮০১ সালে নিকলসন-কার্লাইল বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োগে জলকে অক্সিজেন — হাইড্রোজেনে ভাঙলেন। আর ডেভি ধাতুর যৌগ ভেঙে পেলেন সোডিয়াম, পটাশিয়াম। নরম সোডিয়াম, যা বাতাসের জলের স্পর্শেও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে — সেই বিশুদ্ধ সোডিয়ামকে তেলে ডুবিয়ে রাখা হলো। বিদ্যুতের প্রয়োগে ডেভি পেলেন অন্য মূল ধাতুদের—মেগনেসিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরিণ আর বেরিয়াম। তাঁর জয়যাত্রা কিন্তু বাধা পেল এলুমিনিয়ামকে পৃথক্ করতে গিয়ে। সেদিনের ব্যাটারি দিয়ে এলুমিনিয়ামকে আলাদা করা গেল না ; তাছাড়া দেখা

গেল, এলুমিনিয়ামকে বিশুদ্ধ রূপে পেতে গেলে একটা অনুঘটক বা ক্যাটালিসিসের দরকার। ডেভি অতটা পাবলেন না। ১৮৮৬ সালে চার্লস মার্টিন হল্ ডেভির পদ্ধতি অনুসরণ করে এলুমিনিয়াম অক্সাইড থেকে ক্রাও-লাইটের উপস্থিতিতে পেলেন বিশুদ্ধ ধাতু এলুমিনিয়াম। তার অনেক আগে ১৮২৬ সালে হামফ্রি ডেভি পঞ্চাশ বছরে মারা গেলেন। এই রগচটা, অপ্রিয়ভাষী অহঙ্কারী বিজ্ঞানীটি ইংলণ্ডে রেখে গেলেন তাঁর শিষ্য মাইকেল ফেরাডেকে।

১৯০০ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস হাক্সলে একদা বললেন, 'যদি কোন নেশন বা রাজ্য এক লক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে একজন সম্ভাবনাময় জেমস ওয়াট, হামফ্রে ডেভি বা মাইকেল ফেরাডেকে কিনতে পারে — তবে বলব বড় সস্তাতে কেনা হলো!' ১৯০০ সালের লক্ষ পাউণ্ড আজকের দিনে কোটি পাউণ্ডের সমান। তবু এই দাম সস্তা! আর হাক্সলে যাঁদের কথা বললেন, তারা একধারে তাত্ত্বিক আর প্রয়োগিক বিজ্ঞানী। এককথায় ইঞ্জিনিয়ার।

ফেরাডেকে ইঞ্জিনিয়ার করতে ডেভির শিক্ষা যেমন কাজে লেগেছিল, তেমনি ছিল সে যুগের নানা বিজ্ঞানীর কাজের খোঁজখবর। ১৮১৯ সালে ওরস্টাড দেখলেন ইলেক্ট্রিক কারেণ্ট বিদ্যুতের নিড্‌লকে নড়াতে পারে। এই চুম্বক নিড্‌ল্ নড়ানোর ঘটনা শুনে পরীক্ষাতে এম্পিয়ার পেলেন একতত্ত্ব — লোহা ছাড়া, চুম্বক ছাড়াও চুম্বক ধর্ম তৈরী হয় — তৈরি করে বিদ্যুৎ—ইলেক্ট্রিসিটি। ইলেক্-ট্রিক কারেণ্টের চারপাশে স্পেসের চেহারা ঠিক চুম্বকের চারপাশের স্পেসের মত। ১৯২৩ সালে এম্পিয়ার তাঁর পেপারটি প্রকাশ করলেন। আর বললেন, চুম্বকত্ব বোধহয় আণবিক বিদ্যুতের জন্য ঘটে থাকে। আর আজকে আমরা জানি, এটমের ইলেক্ট্রনের ঘোরা ফেরায় বিদ্যুৎ-স্রোত পাওয়া যায়। এম্পিয়ারের ভাবনাতে আর আজকের তত্ত্বে ফারাক কত কম!

১৮২৭ সালে জার্মানির জর্জ সাইমন ওম তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব জানালেন — যা হলো $I = E/R$।

এই সব কাজের খবর ইউরোপ আমেরিকায় যখন ছড়িয়ে পড়ছে, তখন ১৮২২ সালে মাইকেল ফেরাডে তাঁর নোট বইয়ে লিখে রাখেন — "চুম্বককে বিদ্যুতে রূপান্তরিত কর।" একটি স্বচ্ছ সিধে হুকুম। এই হুকুমটি তিনি নিজেকে দিলেন, প্রথম ইলেক্ট্রিক মোটর তৈরি করে।

১৮২১ সালে ফেরাডে বিয়ে করেছেন। সে বছর বড়দিনের দিনে হাড়কাঁপানো সকাল বেলায় নতুন বউকে তাঁর লেবরেটারিতে নিয়ে এলেন — একটা উপহার দেবেন স্ত্রীকে! কী সেই উপহার সেই ভাবনার উত্তেজনা নিয়ে মিসেস ফেরাডে ঘরে ঢুকে দেখেন — সেই উপহার, যা তাঁর হাত দিয়ে স্বামী মাইকেল ফেরাডে বিশ্ববাসীকে দিয়ে গেলেন। লেবরটোরির টেবিলে একটা মার্কারি ভরা ছোট পাত্র — এক কোণে আছে একটা বার্ ম্যাগনেট, পাত্রের সঙ্গে ভাল করে আঁটা, একটা মুখ শুধু মার্কারির উপর ঝুলছে। একটা তামার রড ম্যাগনেটের উপরে আলতো করে ঝুলিয়ে বাঁধা, যার নীচু অংশ কর্কের মধ্যে সাঁটিয়ে ঢুকিয়ে মার্কারিতে ভাসানো। তামার রডের উপর অংশ আর পাত্রের মার্কারি—এ দুটোতে ব্যাটারি থেকে তার এনে লাগানো—ফলে তামার রডের নীচের অংশটাও মার্কারির পথ ধরে ব্যাটারির সঙ্গে লাগানো হলো আর সার্কিটটা পূর্ণ হলে ম্যাগনেটের উপরে রাখা তামার রডটা বাঁইবাঁই করে ঘুরতে থাকে — মার্কারির পাত্র থেকে ঠিকরে আসে নীলচে সবুজ আলো।

মিসেস ফেরাডে ইলেক্ট্রিক মোটরের যাত্রার সবুজ সংকেত দেখলেন। স্বামীকে বললেন, 'মাইকেল এ কী। — এত আলো কেন? সারামুখে হাসির আলো মাখিয়ে ফেরাডে বললেন, "তোমাকে দেওয়া আমার এই বড়দিনের উপহার। সবার সঙ্গে ভাগ করে নেব কিন্তু।"

তাই হয়। নিঃসন্তান এই দম্পতীর হাত থেকে বিশ্ব-বাসী এই উপহারটিকে আগ্রহে টেনে নেয়। নিউটনের মত মানুষ নয়; একটি যন্ত্র। তাও যে কত সম্ভাবনাময়!

মির্জা নৌশাদ

টেলিভিশন—

বেয়ার্ড

মানুষের সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান কোন কিছুই আজ আর থেমে নেই। সবই এগিয়ে চলেছে। দ্রুত এগিয়ে চলেছে। চলেছে সাফল্যের দিকে—আরো পূর্ণতার দিকে। এমনি করেই পাশাপাশি সমান পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছে ক্যামেরা বা আলোকচিত্র, বায়োস্কোপ বা চলচ্চিত্র, বেতার বা রেডিও। কিন্তু এতেও মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারলো না। ক্যামেরায় মানুষ তাঁর প্রতিরূপ পেলো, বায়োস্কোপের মধ্যে পেলো তাদের বিচিত্র চলমান জগৎ, বেতারের মাধ্যমে পেলে কণ্ঠস্বর—সুর ও সঙ্গীত। শুধু কণ্ঠস্বর, সুর ও সঙ্গীতে মানুষের মন ভরলো না—সে চাইলো তার সঙ্গে মানুষের প্রতিচ্ছবি। আবিষ্কার হলো টেলিভিশন—যা বেতার ও চলচ্চিত্রের একটি অপূর্ব সংমিশ্রণ।

'টেলিভিশন' এর মাধ্যমে আমরা যে শুধু কণ্ঠ, সুর ও সঙ্গীত এবং অভিনয় শিল্পীকেই দেখতে পাই তা নয়—খেলাধূলা এবং অন্যান্য অনেক শিক্ষামূলক বিষয় ও আজ-কাল এর মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এবং তা আমরা ঘরে বসেই চাক্ষুস দেখতে পাই।

অথচ এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারটি যিনি করেন তাঁর নাম—জন লোগী বেয়ার্ড।

বেয়ার্ড ১৮০৮ সালে স্কটল্যাণ্ডের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ধর্মযাজক। বাবার কিন্তু মোটেই ইচ্ছে ছিলো না ছেলেকে তিনি লেখাপড়া শেখান। তাঁর ধারণা ছিলো ছেলে তাঁর পেশা ওই ধর্মযাজকের বৃত্তিই গ্রহণ করবে। আর ধর্মযাজকদের বৃত্তির জন্য বেশী লেখাপড়া শেখার কোন প্রয়োজন নেই। ওই পাঠশালা জাতীয় বিদ্যালয়ের সামান্য লেখাপড়া জানলেই যথেষ্ট। কিন্তু তিনি বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, পুত্র বেয়ার্ডের ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করার কোন ঝোঁক নেই। তার ঝোঁক যন্ত্রপাতির দিকেই বেশী। দিনরাত সে ছোটখাটো যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। যন্ত্রপাতি তার খেলনাপাতি—তাই নিয়ে সে খেলা করতে ভালোবাসে।

বাবার আর বুঝতে বাকি রইলো না বেয়ার্ডের কোন্-দিকে ঝোঁক বেশী। তাই তিনি আর দেরী করলেন না। ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন একটি কারিগরি শিক্ষায়তনে।

বেয়ার্ডের আনন্দ আর ধরে না। এই তো সে চেয়েছিলো। তাইতো সে কারিগরি শিক্ষায়তনে ভর্তি হয়ে কাজ শেখার আগ্রহে অস্থির ও চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। শিক্ষায়তনে ছোট বড় কতরকম যন্ত্র—শেখার কত সাজ-সরঞ্জাম। কয়েক মাসের মধ্যেই ছোট্ট বেয়ার্ড যন্ত্রজগতের অতল গহীনে তলিয়ে গেলো—হারিয়ে গেলো। যন্ত্র, যন্ত্র আর যন্ত্র। সবই তার কাছে নতুন। সবই তার কাছে বিস্ময়। তাইতো সে শিক্ষায়তনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে বেড়াতে লাগলো—পরীক্ষা করতে

লাগলো যন্ত্র—শিখতে লাগলো যান্ত্রিক কাজ। সে যন্ত্র চালানোই শুধু শিখলো না—যন্ত্র বিকল হয়ে গেলে তার দোষ-ত্রুটীও পরীক্ষা করতে লাগলো। এতে শিক্ষকরাও খুব খুশী হলো—তাঁরা বেয়ার্ডকে আন্তরিকভাবে হাতের কাজ শেখাতে লাগলো। হাতের কাজ, যন্ত্রচালনা ও যন্ত্র মেরামতিতে অচিরেই বেয়ার্ড হয়ে উঠলো পারদর্শী। ওই কারিগরি শিক্ষায়তনে বেয়ার্ডের সমকক্ষ আর কেউ রইলো না। সে সকল শিক্ষার্থীকে ডিঙ্গিয়ে, শিক্ষকদের আশীর্বাদ নিয়ে, অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষাক্রম শেষ করে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এলো নতুন পৃথিবীর প্রাঙ্গনে। এ প্রাঙ্গন ধর্মযাজকদের অঙ্গন ছাড়িয়ে—কর্মযাজকের প্রাঙ্গন।

ছেলের সাফল্যে বাবাও খুব খুশী হলেন। তাইতো তিনি পুত্র বেয়ার্ডকে কাছে ডেকে বললেন : "বেয়ার্ড তোমাকে আমি সঠিক পথে দিতে পেরে আনন্দিত—তোমার সাফল্যে আমি অত্যন্ত খুশি। আমি আরো খুশি হবো যদি তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নিয়ে পড়ো।"

চরম দারিদ্রতা থাকা সত্বেও বাবার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে বেয়ার্ড পৃথিবীর বৃহত্তম ও আধুনিক গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনজিনিয়ারিং বিষয়ে পড়বার জন্য ভর্তি হলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তাঁর সত্যসন্ধানী, কৌতূহলী মন, রঙীন স্বপ্ন ও কল্পনার উদ্দাম গতিতে বয়ে চললো। যেনো সমুদ্রের বুকে পাল তোলা জাহাজ। সাগরের তর্জন-গর্জন ও উত্তাল তরঙ্গের ফেনিল উচ্ছ্বাসে সেই জাহাজটি যেমনি আন্দোলিত হয়, তরতর করে এগিয়ে চলে বেয়ার্ডও তেমনি এগিয়ে চললো। বিরাট বিরাট যন্ত্রের ঘর ঘর শব্দ, কম্পন এ সবের মাঝে ওই পাল তোলা জাহাজের মতই বেয়ার্ড আন্দোলিত হতে লাগলো। অনেকটা ওই সাগরের অতল তলে তলিয়ে গিয়ে মুক্তো কুড়িয়ে আনার মতই ব্যাপারটা দাঁড়ালো। যে ছিলো একজন দরিদ্র ধর্মযাজকের ছেলে—যার পেশা হবার কথা ধর্মযাজক, সেই অসহায় বেয়ার্ড হয়ে উঠলো ইনজিনিয়ার।

চরম আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও একমাত্র পিতার আশীর্বাদ, অসীম আত্মবল এবং অনুশীলনের একাগ্রতা সম্বল করে বোয়র্ড অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনজিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করলেন।

প্রবেশ করলেন বৃহত্তর কর্মজগতে। অভিজ্ঞতা দরকার। দরকার অর্থের। এক মোটর কারখানায় তিনি শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগদান করলেন। এখানে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেয়ার্ড ওই কারখানায় কাজ করতেন। ফলে সময় মতো খাওয়া-দাওয়া হতো না। হতো না বিশ্রাম। ফলে অচিরেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লো। পরবর্তীকালে এই ভগ্ন স্বাস্থ্য তিনি আর পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি। তাই বলে তিনি ভেঙ্গে পড়েন নি, কর্মজগত থেকে বিচ্যুত হন নি। তাঁর ছিলো প্রচণ্ড অধ্যবসায় ও অটুট মনোবল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই অটুট মনোবলই তাঁকে সাফল্যের চরম শিখরে নিয়ে গিয়ে পৌছে দিয়েছিলো।

শিক্ষানবীশের পাট চুকিয়ে বেয়ার্ড বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। তিনি বেশ বড় একটি বৈদ্যুতিক কারখানায় চাকরি পেলেন। কিন্তু কয়েক বছর কাজ করার পরই তিনি বুঝতে পারলেন—এ রকম স্বাস্থ্য নিয়ে কোথাও কাজ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। অগত্যা ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণেই তাঁকে চাকরিটা ছাড়তে হলো। চাকরি ছাড়লেও বসে থাকার লোক তিনি নন। তাই বেয়ার্ড ঠিক করলেন, বাড়ীতে বসেই কিছু কিছু গবেষণা করবেন। যান্ত্রিক গবেষণা—নতুন কিছু উদ্ভাবনের গবেষণা। করলেনও তাই।

তখন বিশ্বের কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বেতারের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছবি পাঠানোর জন্যে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। শুধু তাই! জার্মানির ওয়েলার ও নিপ্‌কো এবং ইংলণ্ডের সুইটন

এ বিষয়ে বেশ খানিকটা অগ্রসরও হয়েছিলেন।

এই ব্যাপারটার উপর বেয়ার্ডেরও আকর্ষণ ছিলো। তিনিও এই বিষয়ের উপর আগ্রহী ছিলেন এবং এটা নিয়ে চিন্তাভাবনাও করছিলেন। ভাবছিলেন, ওঁদের অসমাপ্ত কাজের সূত্র ধরে যদি এগোন যায় তাহ'লে তিনি নিজেও কিছুটা এ বিষয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন।

দেখাই যাক না চেষ্টা করে। বলে তিনি চাকরি ছেড়ে গবেষণা শুরু করলেন। নিরালায়, নিভৃতে, একান্তে বসে তিনি গবেষণার কাজ করতে লাগলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চললো তাঁর গবেষণা। তাঁর সেই এক ধ্যান-জ্ঞান। যেমন করে হোক ওয়েলার, নিপকো ও সুইণ্টনের অসমাপ্ত কাজ তাঁকে সমাপ্ত করতেই হবে। প্রচুর অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন সাফল্য তাঁকে অর্জন করতেই হবে। অক্লান্ত পরিশ্রম, আত্ম-প্রত্যয় ও চারিত্রিক দৃঢ়তার বলে বেয়ার্ড এ বিষয়ে বেশ খানিকটা সাফল্য লাভ করলেন। তিনি ভীষণ উৎসাহ পেলেন। পেলেন এগিয়ে যাবার প্রেরণা।

প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বেয়ার্ড চরম সাফল্যের শীর্ষে পৌছুনোর জন্যে ব্যাপক গবেষণা শুরু করলেন। অগ্রসর হলেন আরো—আরো অনেক পথ। কিন্তু পুরো সাফল্যের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো—অর্থ।

বেয়ার্ডের আরো যন্ত্র দরকার। দরকার গবেষণার সাজসরঞ্জাম। তার জন্যে চাই আরো অর্থ। এদ্দিন গবেষণা করতে গিয়ে তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। এমনকি, দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করাও তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে। কি করা যায়? কেমন করে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? কে দেবে তাঁকে অর্থ! কে জানাবে সহানুভূতি? কেউ না। অবশেষে প্রচণ্ড আত্মবল, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও একাগ্রতা নিয়ে ওই পুরনো সব যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম দিয়েই গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অর্থের অভাব, যন্ত্রপাতির স্বল্পতা, ভগ্নস্বাস্থ্য কোন কিছুই তাঁকে দমাতে পারলো না। শুধু তাই নয়! তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, বিনা তারে ছবি পাঠিয়ে বিশ্ব-বাসীকে তিনি চমকিত করবেনই। আর এই আত্ম-বিশ্বাসের জোরেই বেয়ার্ড একবেলা না খেয়েও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাঁর স্বপ্ন সার্থক করার কাজে লেগে রইলেন।

বেয়ার্ড যে ঘরে বসে কাজ করতেন তার পাশের আর একটি ঘরে তিনি একটি সাদা পর্দা টাঙিয়ে রেখে-ছিলেন। উদ্দেশ্য, যদি কোন প্রতিচ্ছবি ঐ পর্দার উপর প্রতিফলিত হয়। গবেষকদের এ রকম আশা থাকাই স্বাভাবিক। আর আশাবাদী না হলে কোন কাজেই সাফল্য লাভ করা যায় না। এটা বেয়ার্ড জানতেন।

বেয়ার্ড সেদিন ভীষণ তন্ময় হয়ে কাজ করছিলেন। সমস্ত যন্ত্রগুলি সার সার সাজিয়ে যন্ত্রাংশগুলি যন্ত্রের মধ্যে বসিয়ে, তীব্র বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করে যন্ত্রগুলিকে বার বার চালিত করছিলেন। সেই সময় এক রকম হঠাৎই তিনি দেখলেন, পাশের ঘরের পর্দায় ফুটে উঠেছে গবেষণাগারে রাখা একটি বস্তুর প্রতিচ্ছবি। কিছুটা অস্বচ্ছ, কিন্তু ছবির প্রান্তগুলি স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত।

আর স্থির থাকতে পারলেন না বেয়ার্ড। উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাঁর সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। এমন কি, সাফল্যের আনন্দে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এতদিনে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে।

কাজেই বুঝতে পারছো, এতদিনের দুঃখ-কষ্ট, অক্লান্ত পরিশ্রম, অর্থের অভাব, অন্নের অভাব সব কিছু তিনি ভুলে গেলেন। এবার তিনি চরম সাফল্যের নেশায় উন্মাদ, অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যেমন করেই হোক, তাঁর এই সব পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়েই তিনি পর্দার বুকে প্রতিফলিত ছবিটি সুস্পষ্ট করবেন। কিন্তু না, শত চেষ্টা করেও তিনি তা পারলেন না। তখন তাঁর মনে হলো, এই ব্যাপারটাকে আরো উন্নত করার জন্য চাই আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম। আর এর জন্যে চাই অর্থ। তখন তাঁর চরম অবস্থা। যন্ত্র কেনা তো দূরে থাক্, এক বেলা পেটের অন্ন জোগাড় করতেই তিনি হিমসিম খাচ্ছেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, তবে কি আমার এতদিনের সাধনা, আমার কল্পনা, আমার স্বপ্ন সার্থক রূপ নেবে না! আমি কি জগতবাসীকে বিনা-তারে ছবি পাঠিয়ে দেখাতে পারবো না? না, তা হতে পারে না। কিছুতেই না। আমার এ স্বপ্নের স্বার্থক রূপায়ণ আমাকে করতেই হবে। যেমন করেই হোক, যে মূল্যের বিনিময়েই হোক। বেয়ার্ড আরো ভাবলেন, প্রয়োজন হয় আমি আমার সাফল্যের জন্যে বৈজ্ঞানিকদের কাছে অর্থ সাহায্য চাইবো। তবু এ কাজ আমাকে শেষ করতেই হবে।

এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পৈতৃক ভিটা ছেড়ে সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে বেয়ার্ড চলে এলেন লণ্ডনে। এখানে এসে তিনি বৈজ্ঞানিকদের দ্বারে দ্বারে গেলেন; সব ঘটনা খুলে বললেন। চাইলেন গবেষণার অর্থ। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই তাঁকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন না। জানালেন না এতটুকু সহানুভূতি। ফলে বেয়ার্ড এবার আরো বিপাকে পড়ে গেলেন। এদ্দিন যদিও বা তাঁর নিজের শহরে, একবেলা খেয়ে না খেয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন—কিন্তু সুবিশাল লণ্ডন শহরে এসে তাঁর সব কিছুই কি বানচাল হয়ে যাবে নাকি?

কিন্তু বেয়ার্ড হতাশ হলেন না। ভেঙেও পড়লেন না। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও অসীম মনোবল সম্বল করে তিনি লণ্ডনেই থেকে গেলেন। অপরিচিত মহলে, স্বল্প পরিসর জায়গায় দোতলার উপর তিনি দু'খানা ঘর ভাড়া করলেন। কারো সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি ছাড়াই চরম অভাব-অনটনের মধ্যেই বেয়ার্ড তাঁর গবেষণা পুনরায় শুরু করলেন।

পুরনো যন্ত্রপাতির আস্তানা ঘুরে ঘুরে তিনি সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও সাজ সরঞ্জাম খরিদ করলেন। আর একবেলা খেয়ে, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। নীরবে, নিভৃতে, একান্তে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, গবেষণা করে বেয়ার্ড আরো সাফল্য লাভ করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, আগের চেয়ে আরো সুস্পষ্ট ছবি পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে। আরো নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য তিনি বার বার পরীক্ষা করলেন। কিন্তু প্রতিবারই পরিষ্কার ও স্বাভাবিক সুস্পষ্ট ছবি তিনি পেলেন। তাঁর আর কোন সন্দেহ রইলো না—তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

কোন বস্তুর ছবি পর্দার বুকে প্রতিফলিত হয়ে তা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠুক—এটাই শুধু বেয়ার্ডের উদ্দেশ্য ছিলো না। উদ্দেশ্য ছিলো, বিনাতারে মানুষের ছবি পর্দার বুকে প্রতি-

ফলিত করে বিশ্ব মানবকুলকে চমকিত করা। কথাটা মনে হতেই একদিন তিনি একটি লোকের প্রয়োজন অনুভব করলেন। এই মুহূর্তে একটি লোক তাঁর চাই। কিন্তু সে সময়ে তাঁর কাছাকাছি কোন পরিচিত লোক ছিলো না। অথচ লোক তাঁর দরকার। তিনি আর মুহূর্ত মাত্র দেরী করলেন না। তরতর করে নেমে এলেন নিচে। এসেই একটি ছোক্‌রাকে দেখতে পেলেন। তাকে সব ঘটনা বুঝিয়ে বলতে সে রাজি হলো। বেয়ার্ড তাকে নিয়ে এলো গবেষণাগারে। তারপর ঐ ছোকরাকে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে অধীর আনন্দে নিজে ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। কিন্তু একি! তিনি হতাশ হয়ে দেখলেন, পাশের ঘরের পর্দায় কারোর ছবিই প্রতিফলিত হয়নি! ব্যাপার কি? তবে কি এতদিনের পরিশ্রম তাঁর ব্যর্থ হলো—সার্থক হলো না তাঁর স্বপ্ন! রাগে, দুঃখে ও মনস্তাপে ফিরে এলেন গবেষণাগারে। এসেই তো তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন ছোকরাটি দরজার আড়ালে লুকিয়ে আছে।

বেয়ার্ডকে দেখে সে চীৎকার করে বললো: ওরে বাপ্‌রে! যেসব বিদ্‌ঘুটে যন্ত্রপাতি ও আলো, ওর সামনে কি দাঁড়িয়ে থাকা যায়! আমার রীতিমত ভয় ভয় করছিলো। তাই আমি সরে এসে লুকিয়ে আছি। আমি ঐ যন্ত্রের সামনে দাঁড়াতে পারবো না। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চলে যাই। বলে ছোকরাটি দে ছুট। আরে সে কি! এই খোকা যাচ্ছো কোথায়? শোন। শোন। বলে বেয়ার্ডও ছুটে গিয়ে তাকে ধরে আনলেন। বললেন, দেখো তুমি মিথ্যে মিথ্যে ভয় পাচ্ছো। এতে ভয়ের কিছু নেই। ওগুলি নিছক যন্ত্র—কোন দত্যি-দানব নয় যে তোমাকে গিলে খাবে। ওই সব যন্ত্রগুলিকে আমি যেভাবে চালিত করবো তারা সেইভাবে চলবে। যন্ত্র মানুষের বশে। তাছাড়া আমি যে পরীক্ষা করতে চলেছি তাতে তোমার ছবি যদি পর্দার বুকে প্রতিফলিত হয় তাহ'লে বিশ্ববাসী জানবে, এই যন্ত্রের মাধ্যমে প্রথম যে মানুষের ছবি পাঠানো হয়েছিলো—সেটা তোমারই ছবি। এমনি অনেক কথাই বললেন ছোকরাকে। অনেক করে বোঝালেনও। কিন্তু কে কার কথা শুনে। ছেলেটির ওই এক কথা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চলে যাবো।

বেয়ার্ড ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন: কি চাও তুমি? টাকা! কত টাকা চাই তোমার? আমি তোমাকে টাকা দেবো। মোটা টাকা। বলো, বলো তুমি রাজি।

ছেলেটি কেমন যেন ঘাবড়ে গেলো। কিন্তু টাকার ব্যাপারটা তার বেশ মনে ধরলো। গরীবের ছেলে। তাই টাকার লোভে সে রাজি হয়ে গেলো।

এই ঘটনার উল্লেখ করে পরবর্তীকালে বেয়ার্ড এক জায়গায় নিজেই লিখেছেন—'পৃথিবীতে প্রথম যার ছবি টেলিভিশনে পাঠানো হয়, স্বেচ্ছায় সে আসেনি, মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে তাকে রাজি করানো হয়েছিলো'

বহু বিজ্ঞানীর কল্পনা, স্বপ্ন ও সাধনার সূত্র ধরে বেয়ার্ড আবিষ্কার করলেন টেলিভিশন। কণ্ঠ, সুর ও সঙ্গীতের সঙ্গে বিলাসী মানুষেরাও তাঁদের কাঙ্খীত শিল্পীর ছবি পেলেন। ফলে বিশ্ববাসীরা চমকিত হলেন। বেয়ার্ডও পেলেন বৈজ্ঞানিকের খ্যাতি ও জয়মাল্য। সারা দেশ-বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো। এলো অর্থের প্রাচুর্য।

কিন্তু চিরকালের উপেক্ষিত ও দারিদ্রের কশাঘাতে জর্জরিত ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী সেই মানুষটি কিন্তু বিশ্ব-বাসীর অভিনন্দন ও বৈজ্ঞানিকদের স্বীকৃতি পেয়েই নিজের অধ্যবসায় ও সংগ্রামের কথা ভুলে গেলেন না। আর্থিক প্রাচুর্য পেয়েও চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। শুরু করলেন, আবার গবেষণা।

এবার তাঁর উদ্দেশ্য হলো, টেলিভিশনের মাধ্যমে সাদা-কালো ছবি পাঠানো যায় কিনা তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। যেমনি ভাবনা—তেমনি কাজ। শুরু করলেন গবেষণা। তখন তাঁর টাকার অভাব নেই। কাজেই এদ্দিন যে যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম তিনি কিনতে পারেন

নি, এবার সেই সকল প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তিনি ক্রয় করলেন। ক'রে পরীক্ষা সুরু করলেন এবং অচিরেই তার ফল পেলেন। তিনি টেলিভিশনের মাধ্যমে নিয়মিত সাদা কালো ছবি পাঠানোর ব্যবস্থা পাকা করলেন। তাঁর সেই ব্যবস্থা অনুসারে বা পদ্ধতি অনুযায়ী ১৮৩৬ সালে বিলেতে প্রথম টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হলো নিয়মিত।

বিজ্ঞানী বেয়ার্ড এখানেই থেমে গেলেন না। তিনি বিশ্রাম নিলেন না। পুনরায় গবেষণা শুরু করলেন। এবার-কার স্বপ্ন হলো, টেলিভিশনের মাধ্যমে রঙীন ছবি পাঠানো যায় কিনা। অনেক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, অবশেষে তিনি এই ব্যাপারটায়ও সাফল্য লাভ করলেন। অর্থাৎ বেয়ার্ড 'টেলিভিশনে রঙীন ছবি' প্রেরণেও সমর্থ হলেন। ইংরেজী ১৯৪১ সালে বিশ্ববাসী টেলিভিশনে প্রথম রঙীন ছবি দেখলেন।

টেলিভিশন আবিষ্কারক, টেলিভিশনে সাদা-কালো ছবি পাঠানোর উদ্ভাবক ও রঙীন ছবি প্রেরণের স্রষ্টা এর পরেও আরো ২৩ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে শেষকালে দীর্ঘদিন উপভোগ করে গেছেন। জীবদ্দশায় দেখে গেছেন, মানুষ তাঁর সৃষ্টির আনন্দে কত উৎফুল্ল। কিন্তু এত গৌরব, এত খ্যাতি ও অর্থের মধ্যেও বেয়ার্ড তাঁর ধর্মযাজক পিতার নিঃস্বার্থ অবদান, সামাজিক উপেক্ষা, অবজ্ঞা—অভাব-অনটনের কথা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বার বার স্মরণ করেছেন। তাঁর যেন মনে হয়েছে, আমার এ যশ কীর্তি আমার পাওনা নয়—এর সবটুকু পাওনাই তাঁর পিতার।

বেয়ার্ড আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি, তার কীর্তি আজ পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে, মানুষের অবসর বিনোদনের খোরাক জোগাচ্ছে। এর মধ্য দিয়েই বেয়ার্ড চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

১৮৮৮ সালে স্কটল্যাণ্ডে জন লোগী বেয়ার্ড জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৪ সালে ৭৬ বছর বয়সে ইংলণ্ডে মারা যান বৈজ্ঞানিক বেয়ার্ড।

With
Best
Compliments
of

THE MUKHERJEE CATERER.

THAKURBARI STREET,

SERAMPUR

সে আসছে!

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ॥

শেষ রোগীটি চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাবার পর ডাঃ মালহোত্রা যখন শরীরটা টান টান করে নিচ্ছেন, নিঃশব্দ পায়ে সে চেম্বারের সামনে এসে দাঁড়াল। সে।

রাত সোয়া দশটা। মাঘের শেষ। চলে যাবার আগে কলকাতার শীত একেবারে মরণ-কামড় দিচ্ছে। অদ্ভুত ঠাণ্ডা পড়েছে কদিন। দশটার মধ্যেই পথঘাট নির্জন হয়ে যায়। গাড়ির জানলার কাচ পুরোপুরি বন্ধ করেও স্টিয়ারিং-এ হাত অবশ হয়ে আসে ডাঃ মালহোত্রার।

এক কাপ কফি খেয়ে নিলে হতো। পুরো আড়াই ঘণ্টা একভাবে বসে আছেন। ঘাড় টন্‌টন্ করছে।

বেল টিপলেই রঘুবীর এসে দাঁড়াবে। রাত যতই হোক, এক কাপ কফির ব্যবস্থা সে নিশ্চয়ই করে দেবে। তবু বেল টেপার জন্যে হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নিলেন তিনি।

না, আর দেরি করা ঠিক নয়—অনেকখানি রাস্তা যেতে হবে। তার ওপর আজকের কালেকশনটাও অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী। তাই হয় অবশ্য সাধারণত। সোমবার সকালটা রেস্ট নেন বলে রবিবারের সন্ধ্যেটা একটু বেশিক্ষণই থাকেন তিনি। হাজার খানেক অন্য সব দিনেই হয়। খ্যাতনামা হার্ট স্পেশালিস্ট হিসাবে ভীড়টা তাঁর এখানে একটু বেশিই। সব রোগী দেখা সম্ভব হয় না রোজ, রবিবার দিনটা তিনি পারতপক্ষে কাটকে ফেরান না।

ড্রয়্যারটা টেনে টাকাগুলো যখন মালহোত্রা তাঁর বড় পার্সে ভরছিলেন, সে তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল চেম্বারের সামনে দাঁড় করানো ছোট ফিয়াট গাড়িটার সামনে। দরজার ল্যাচে হাত দিয়ে সে বুঝতে পারছিল, চাবি দেওয়া নেই।

পেটমোটা পার্সটা মালহোত্রা ঢুকিয়ে নিলেন কোটের পকেটে। উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। চেয়ারে ক্যাঁচ করে একবার শব্দ হতেই রঘুবীর এগিয়ে এলো।

'ঠিক হ্যায়, বন্ধ্ কর্ দেও।'

৮৭ পাতার পর

কিছুক্ষণের জন্যে। আবার শুনতে পেলেন সেই কণ্ঠস্বর—'আশা করি আপনি শুনতে পেয়েছেন—আমি আপনাকে গাড়ি থামাতে বলেছি।'

মালহোত্রা বুঝতে পারছিলেন, কথা বলে কোন লাভ নেই। কথা বলবার শক্তিও যেন ফুরিয়ে আসছিল ক্রমশ। দু-একবার ইতস্তত করে তিনি ব্রেকে চাপ দিলেন। চাকা ঘষবার আওয়াজ তুলে গাড়িটা থেমে গেল।

এই শীতের রাতেও কপাল ভিজে উঠল মালহোত্রার। সামনের আয়নার দিকে একটু ঝুঁকে তিনি এখন দেখতে পাচ্ছেন তাকে। পিঠে যেটা ঠেকানো আছে সেটা চোখে দেখতে না পেলেও জিনিষটা যে কী, তা বোঝা মোটেই কষ্টকর নয়।

'কি চাও তুমি?' ফিস ফিস করে বললেন মালহোত্রা—'টাকা?'

'ঠিক ধরেছেন। আপনি বেশ বুদ্ধিমান লোক দেখছি'—সে আগের মতই ধীরস্থির ভাবে কথা বলছিল, 'আপনার মোটা পার্সটা আমার দিকে এগিয়ে দিন—যেমন আছেন তেমনি ভাবেই, সামনে ঘুরবার দরকার নেই।'

কথা না বলে কোটের পকেটে হাত ঢোকালেন মালহোত্রা। মাথার শিরা দপ দপ করছিল। এমনি করে ভয় দেখিয়ে একটা নিগ্রো ছোকরা তাঁকে বোকা বানিয়ে চলে যাবে! তাও এই কলকাতা শহরে!

ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন তিনি। অসহ্য বিরক্তিতে কেঁপে উঠল সারা দেহ।

এককালে রীতিমত শরীর-চর্চা করতেন তিনি। বক্সিংও শিখেছিলেন অল্পস্বল্প। কিন্তু সে তো আজ অনেক কাল আগেকার কথা। এতদিন পরেও কি সেসব বিদ্যে কাজে লাগাবে! সবচেয়ে বড় কথা, ছেলেটির সঙ্গে আছে রিভলভার, খালি হাতে ওর সঙ্গে লড়তে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। তবু—

পকেট থেকে পার্সটা বার করলেন মালহোত্রা। আয়নার কাছে স্থির লক্ষ্য রেখেছেন ছোকরার দিকে।

ওর মুখে কোন ভাবলেশ নেই। উজ্জ্বল চোখের তীব্র দৃষ্টি এখনো স্থির। একটু নড়ছেনা পর্যন্ত সে। রিভলবারের নল তেমনি ঠেকানো আছে পিঠে।

পার্সটা আস্তে আস্তে ওর দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন মালহোত্রা। মাথার ভেতর একটা শিরশিরে অনুভূতি। হাতটা কাছাকাছি নিয়ে গিয়েই একটা কাণ্ড করে বসলেন। পার্সসমেত হাতটা সজোরে চালিয়ে দিলেন তার মুখের ওপর।

মুহূর্তের জন্যে পিঠের ওপর সেঁটে ধরা ধাতব স্পর্শ সরে গেল।

এই সুযোগটুকুরই অপেক্ষা করছিলেন তিনি। এক সেকেণ্ডও সময় নষ্ট না করে সামনে ফিরে তীব্র একটা হুক করলেন ওর বাঁ চোয়াল লক্ষ্য করে, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা বেশ বড়সড় পাঞ্চ চালিয়েছেন বাঁ হাতে।

সমস্ত ঘটনাটাই ঘটল এত আকস্মিকভাবে যে, সে কিছু বুঝবার আগেই তার মাথাটা আছড়ে পড়ল পেছনের সীটে, এলিয়ে পড়ল সে। হাত থেকে ছিটকে পড়ল সেই রিভলভার।

তিলমাত্র দেরি করলেন না মালহোত্রা। গলা থেকে টাই-টা খুলে ফেলে বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেললেন ওর হাত দুটো। গাড়ির জানালা খুলে রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাস্তায়। তারপর গাড়িটা চকিতে স্টার্ট দিয়ে সোজা ঢুকিয়ে দিলেন সামনের পুলিশ-ফাঁড়িতে।

এবার আর ভুল করলেন না, গাড়ির দরজা ভাল করে লক করে এগিয়ে গেলেন সামনে।

টেবিলের সামনে বসে ঢুলছিল আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দেওয়া একটি মানুষ। তিনি যে ঘরে ঢুকেছেন, টের পেল বলেও মনে হল না। দু-এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে হালকা করে একবার কাশলেন মালহোত্রা। আসলে, প্রচণ্ড উত্তেজনায় তিনি তখনো থর থর করে কাঁপছেন। কপালটা তখনও তাঁর ভিজে রয়েছে। দেরি করতে না পেরে টেবিলে জোরে দুবার আঙুলের টোকা দিলেন।

স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত সোজা হয়ে উঠল মানুষটি, এবং একটুও সময় না নিয়ে বাজখাঁই গলায় বললে, 'কি চাই ?'

'ও সি আছেন ? বিশেষ দরকার।'

'আপাতত এই অধম সাব-ইনসপেক্টরকেই বলুন না ! ব্যাপারখানা কি ?'

'দারুণ ব্যাপার ঘটেছে—রাহাজানির চেষ্টা।'

'হামেশাই ঘটছে !' সাব-ইনসপেক্টর বিরস মুখে বলল, 'এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়।'

'কিন্তু আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল—হাতে নাতে ধরে ফেলেছি আমি।'

'বলেন কি, ধরে ফেলেছেন ?' এস-আই আড়ি-মুড়ি ভাঙলো—'তাহলে তো কাজ অনেক সহজ করেই এনেছেন। কোথায় সে ?'

'আছে, আমার গাড়িতেই আছে। কখন লুকিয়ে উঠে পড়েছে টের পাইনি, মাঝ রাস্তায় হঠাৎ পিস্তল ঠেকিয়ে টাকা চাইল। ভাগ্য ভাল, হঠাৎ তাকে অ্যাটাক করে ধরাশায়ী করে ফেলেছি।'

'ধরাশায়ী ? তাহলে তো তাড়াহুড়োর কিছু নেই'—এস-আই একটা জাবদা খাতা সামনে এগিয়ে দিল, 'চটপট লিখে ফেলুন তো ঘটনাটা।'

'লিখে ফেলবো ?'

'নিশ্চয়ই—ডাইরি ছাড়া কোন কেস কি টেক আপ করতে পারি নাকি ?'

মালহোত্রা রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। মুখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। পেন বার করে খসখস করে দু-চার লাইন লিখে ফেললেন। তলায় নাম সই করে এগিয়ে দিলেন।

'চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ, পড়ে দেখুন না—বয়স পঁচিশের মধ্যে, রং কালো, চুল কোঁচকানো, ইংরাজিতে কথা বলে। সম্ভবত নিগ্রো।'

'ঠিক আছে, চলুন—মাণিকটিকে একবার চোখে দেখা যাক !' চেয়ারে বসেই একটা হাঁক ছাড়লেন—'ভীম সিং !'

কোথায় ছিল কে জানে, হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে হাজির হল আর একটি আষ্টেপৃষ্ঠে মাফলার জড়ানো মুখ। রোগা হাড়-জিরজিরে চেহারা—কোন রকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা স্যালিউট করল।

'চলুন'—চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল এস-আই। মালহোত্রার অসহ্য লাগছিল। গাড়ি পর্যন্ত এসে ল্যাচে চাবি ঢোকাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ভেতরে চোখ পড়তেই বুকটা ধড়াস করে উঠল !

ভাল করে চেয়ে দেখলেন। চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল তাঁর। হাতের চাবি হাতেই থেকে গেল—অবাক চোখে চেয়ে রইলেন ফ্যাল ফ্যাল করে।

আশ্চর্য ! গাড়ির মধ্যে এ কে বসে রয়েছে ? এতো সে নয় !

(চলবে)

সূর্য স্থির পৃথিবীই ঘুরছে

বিশ্বজিৎ দাস

আজকের দিনে তোমরা আমরা সবাই এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান। কিন্তু চার শো বছর আগেও লোকে ঠিক এর উল্টোটাই বিশ্বাস করতো।

যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর আগে এক বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল বলেছিলেন যে পৃথিবী স্থির হয়ে আছে আকাশের একছত্র অধিপতির মত; আর চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্ররা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের চারপাশে।

যদিও এরও প্রায় ২০০ বছর আগে পীথাগোরাস বলেছিলেন যে পৃথিবীই বৃত্তাকার পথে চলমান তবু এ্যারিষ্টটলের মতবাদই লোকেদের মনে ধরেছিল। প্রায় দু হাজার বছর লেগেছিল মানুষের মন থেকে সেই মতবাদ মুছে যেতে।

এ্যারিষ্টটলের বহু বছর পরেও মার্টিন লুথার, বিখ্যাত পণ্ডিত টলেমী—এঁরাও পৃথিবী যে স্থির এই ধারণাতেই বিশ্বাসী ছিলেন।

শুধু তাই নয়, এমন অদ্ভুত বিশ্বাসও একসময় ছিল যে পৃথিবীটা একটা চৌকো সমতল জায়গা; তার ওপর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত কেউ যদি চলে যায় তাহলে একসময় সে ধুপ করে গড়িয়ে নরকে পড়ে যাবে।

কিন্তু আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে কোপারনিকাস নামে এক বিজ্ঞানী নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারলেন যে সূর্য নয়, পৃথিবীটাই অত্যন্ত অনুগত ও বাধ্য ছেলের মত সূর্যের চারপাশে নিয়মমাফিক ঘুরে চলেছে এবং সূর্যকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে অন্যান্য গ্রহ আর তারকারা; যদিও এ কথাটাও পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ তারকারা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে না; কেবলমাত্র সূর্যের নিজস্ব গ্রহগুলিই তাকে প্রদক্ষিণ করে। তারকাদের রয়েছে এরকম আলাদা আলাদা গ্রহ-জগৎ। আবার এই সূর্য আর তারকারাও কোন এক নীহারিকার আকর্ষণে গতিশীল হয়ে রয়েছে।

সে যাই হোক, মোটামুটিভাবে পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যে সূর্যই যে স্থির একথাটা বলা ছিল তখনকার দিনের গোঁড়া সমাজে এক ভয়ংকর পাপ। কোপারনিকাস তাই এ সত্যটি অনুভব করেও প্রকাশের সাহস পান নি। তবে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে মুদ্রিত হয়ে বেরুলো সেই বই। তাও আবার এমন ভাষায় লেখা যে একমাত্র বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই তার মর্মোদ্ধার সম্ভব।

বইখানা নিয়ে তেমন কোন গোলোযোগ হয়নি। চার্চও বইখানাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত

হয়েছিল।

কিন্তু সেই যে সত্যের বীজ সৃষ্টি হোলো তা অঙ্কুরিত হ'ল আরও কিছু বছর বাদে ইটালীর নোলা শহরে। জিওর্দানো ব্রুনো নামে এক অনুসন্ধিৎসু যুবক আলমারীর ধুলিমলিন শেলফ থেকে খুঁজে পেলেন কোপারনিকাসের এই বইয়ের একটা কপি। দুঃসাহসী ব্রুনো কোপারনিকাসের সেই মত চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। খালি চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্রুনো এমন সব কথা ব্যক্ত করলেন যা পরবর্তী কালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বললেন "এই যে সব নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে এ সবেরই আরম্ভ আছে আবার শেষও আছে। এরা সর্বদাই পরিবর্তনশীল।"

এ যে বড় ভয়ংকর কথা। কারণ বাইবেল বলছে এই বিশ্ব অবিনশ্বর, ধ্বংসহীন। চিরকাল সে একই ভাবে থাকবে।

সুতরাং গীর্জার পুরোহিতেরা উঠে পড়ে লাগলেন এই অধার্মিক পাপীকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য। পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন ব্রুনো। শেষ পর্যান্ত ধরা পড়লেন গিয়োভান্নি মোসেনিগো নামে এক বিশ্বাসঘাতকের নিখুঁত চক্রান্তে।

আট বছর তাঁকে বন্দী করে রাখা হোলো। গরমকালে তাঁকে রাখা হোতো সীসের তৈরী একটা ঘরে; অসহ্য গরমে সেখানে ব্রুনো ঝলসে যেতেন। আবার শীতকালে তাঁকে রাখা হোতো লাসকাটা ঘরে; অসম্ভব ঠাণ্ডায় তিনি কুঁকড়ে যেতেন। কিন্তু কোপারনিকাসের মতবাদকে তিনি কখনো ভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন নি।

শেষ পর্যন্ত বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হোলো। জিভ বেঁধে ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

'পৃথিবী ঘুরছে, সূর্য স্থির' এই সত্যভাষণের জন্য প্রথম শহীদ জিওর্দানো ব্রুনো।

ব্রুনো যখন মারা যান তখন ৩৬ বছর বয়স্ক গ্যালিলিও ইটালীর পিসা শহরে টেলিস্কোপ তৈরী করে আকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু করেছেন। তিনিও অনুভব করলেন কোপারনিকাসের তত্ত্বই ঠিক। কিন্তু তৎকালীন গোঁড়া সমাজ পরীক্ষিত সত্যকেও মেনে নিতে অস্বীকৃত হল কারণ তা এ্যারিষ্টটলের বইয়ে নেই, নেই বাইবেলেও।

শেষ পর্যন্ত সত্তর বছর বয়েসে গ্যালিলিওকে

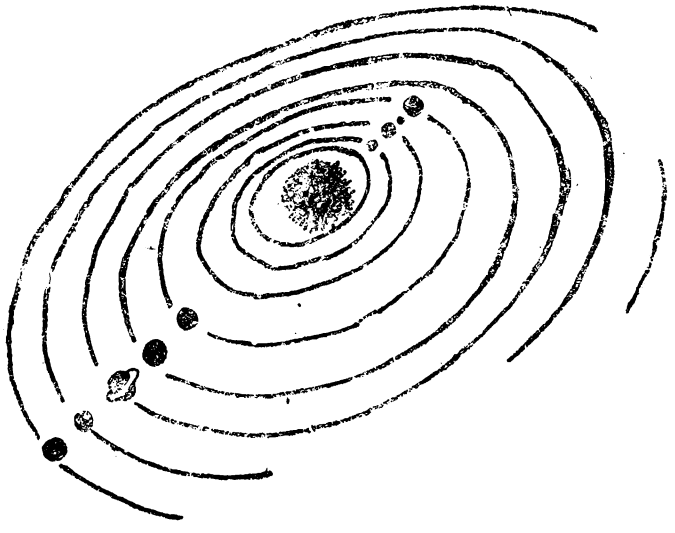

রোমের বিচারকমণ্ডলীর মুখোমুখি হতে হোলো এই অধার্মিক মত প্রচারের জন্য। শাস্তি আর অত্যাচারের ভয়ে গ্যালিলিও সর্বসমক্ষে স্বীকার করলেন 'কোপারনিকাসের তত্ত্ব ভুল। আসলে পৃথিবী স্থির, সূর্যই ঘুরছে।' স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও অনির্দিষ্ট কাল তাঁকে বন্দী করে রাখার নির্দেশ

জারি হোলো। আর সেই সাথে তিনবছর ধরে প্রতি সপ্তাহে সাতটি করে বাইবেলের শ্লোক তাঁকে উচ্চারণ করতে হবে। শাস্তির কথা শুনে গ্যালিলিও ক্লান্ত স্বরে জনান্তিকে বললেন—'তবু পৃথিবীই ঘুরবে।'

এরপর গ্যালিলিও বেঁচেছিলেন মাত্র ৮ বছর। তিন বছর পর তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন; তবু কোন বন্ধু-বান্ধবকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হোতো না। শেষ পর্যন্ত গ্যালিলিও মারা গেলেন ১৬৪২ সালে।

গ্যালিলিওর সমসাময়িক দেকার্ত, কেপলার—এঁরাও ঐ একই সত্য বিশ্বাস করতেন যে সূর্যই স্থির, আর পৃথিবীই তাকে বার বার প্রদক্ষিণ করে চলেছে। কিন্তু গীর্জার পুরোহিতদের ভয়ে তাঁরাও মুখ খুলতে সাহস পান নি।

কিন্তু সত্য কোনদিন অপ্রকাশিত থাকে না। যে বছর গ্যালিলিও মারা গেলেন, ঠিক সেই বছরই জন্ম হোলো আইজাক নিউটনের।

তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভায় প্রতিষ্ঠা করলেন শাশ্বত সত্যকে। মৃত্যুর ৫০ বছর পর গ্যালিলিও পেলেন তাঁর যোগ্য সম্মান। তাঁর কবরের ওপর নির্মিত হোলো একটি স্মৃতিসৌধ। আর মৃত্যুর প্রায় ২৮৯ বছর পরে ব্রুনোকে যে বাগানে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল সেখানে তৈরী হোলো এক স্মৃতিস্তম্ভ।

তাহলে ছাখো আজকের এই সহজ সত্যটি প্রতিষ্ঠার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে কত করুণ ইতিহাস। তোমরা তার কথা একবার অন্ততঃ ভেবো।

With
Best
Compliments
of

M/S. THE JANATA MACHINERY STORES

10/1/A, RAILWAY GATE,
JESSORE ROAD
P. O.—Habra, Dist.—24-Parganas.

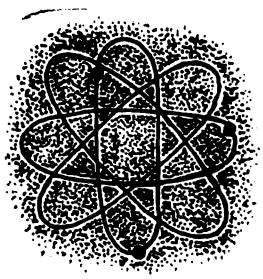

পরমাণু-শক্তির গল্প

লরা ফের্মি

২

পরমাণুকে ভাঙ্গা যায়

পদার্থের 'ক্ষুদ্রতম' কণা হিসেবে পরমাণুর চিন্তা পৃথিবীতে প্রথম কে করেছিলেন তা জানা যায় নি। তবে, আড়াই হাজার বছর আগের গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস যে তাঁদের মধ্যে একজন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ডেমোক্রিটাস তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করতে পারেন নি। তখন অনেকেই এটাকে 'ডেমোক্রিটাসের হেঁয়ালি' বলে ভাবতেন। ইংরেজ বিজ্ঞানী ডালটনই প্রথম (১৮১০ খৃঃ) এর একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দেন। তাতে তিনি বললেন, একই পদার্থের পরমাণুগুলো সব একই রকমের এবং ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পরমাণু মিলিত হয়ে এক একটি 'যৌগ' তৈরী করে। এদের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম অণু। এই তত্ত্বের সাহায্যে অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও, গত শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁর একটি কথায় বিজ্ঞানীদের সন্দেহ দেখা দিল—সেটি হল, পরমাণুকে ভাঙ্গা যায় না। পরমাণুকে ভাঙ্গার আগে তেজস্ক্রিয়তা কীভাবে আবিষ্কার হল এখানে সে কথাই আছে।

মাদাম কুরী

(ক)

আমরা জানি ফসফরাসের মত এমন কিছু পদার্থ আছে যেগুলি সূর্যের আলো বা অন্য কোন আলোয় থাকার পর অন্ধকারের মধ্যেও কিছুক্ষণ আলো দেয়। ফসফরাসের নামে ইংরেজীতে এদের বলা হয় 'ফসফোরেসেণ্ট'—বাংলায় বলে 'অনুপ্রভ'।

১৮৯৬ সাল নাগাদ প্যারিসে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরি বেকারেল এরকম কিছু অনুপ্রভ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে অদ্ভুত একটি ঘটনা লক্ষ্য করলেন।

তিনি একটি ফটোগ্রাফি প্লেটকে পুরু কাগজে মুড়ে তার উপর এক টুকরো ইউরেনিয়াম যৌগ সূর্যের আলোর মধ্যে রাখেন। পরে, কাগজের মোড়ক সরিয়ে দেখেন প্লেটের উপর ঐ টুকরোর কাল ছবি আছে। তখন তিনি ভাবলেন, ঐ টুকরো থেকে নিশ্চয় এমন রশ্মি বেরিয়েছে যা কালো কাগজকেও ভেদ করতে পারে। কিছুদিন পর আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার তাঁর চোখে পড়ল। তিনি দেখলেন, ঐ টুকরোকে সূর্যের আলোর মধ্যে না রাখলেও তা কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফি প্লেটের উপর দাগ ফেলে। অর্থাৎ, ইউরেনিয়াম যৌগের টুকরো আলোর মধ্যে না থাকলেও নিজের থেকেই রশ্মি বিকিরণ করে।

বেকারেল এই একটি ঘটনায় খুশি হলেন না। তিনি ঐ রকম ইউরেনিয়াম যৌগের অনেকগুলো টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, মেঘলা দিনেও একই রকম ফল পাওয়া যাচ্ছে।

এরপর বেকারেলের আগ্রহ আরও বাড়ে। তিনি ইউরেনিয়ামের আরও নানারকম যৌগ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন, সূর্যের আলোয় না রাখলেও সেগুলি রশ্মি বিকিরণ করে। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে, ইউরেনিয়ামই এমন একটি মৌল যা এভাবে রশ্মি বিকিরণ করে। কিন্তু, ইউরেনিয়াম ছাড়া আর কেউ কি নয়? বেকারেল এর জবাব দিতে পারেন নি।

(খ)

কিছুদিন পর মেরী কুরী নামে এক অল্পবয়স্কা মেয়ে এমন কিছু পদার্থ আবিষ্কার করলেন যা ইউরেনিয়ামের মত রশ্মি বিকিরণ করে।

মেরীর জন্ম পোল্যাণ্ডে। সেখানে ধনী পরিবারের ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে যে অর্থ উপায় করেছিলেন তা থেকেই তিনি তাঁর প্যারিসে পড়ার খরচ চালিয়েছেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন, পরে সেখান থেকেই পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কে ডিগ্রি নেন।

মেরী বেশ সুন্দর দেখতে মেয়ে ছিলেন। হাল্কা রঙের চুলের মধ্যে তাঁর মুখখানি আরও সুন্দর দেখাত। গবেষণা ছাড়া পোষাক-আশাক চেহারার উপর তিনি কোন লক্ষ্য রাখতেন না। পরে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক পিয়ের কুরীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁরা পরে বিয়ে করেন এবং ১৮৯৭ সালে তাঁদের একটি মেয়ে হয়। তাঁরা এঁর নাম রাখেন আইরিন। পরে তাঁদের আর একটি মেয়ে হয়—নাম দেন ইভ।

প্রথম সন্তান আইরিনের জন্মের পরেই মেরী কুরী, বেকারেল যে রশ্মি দু-বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাইলেন। মেরী কুরীর মত পিয়েরেরও বিজ্ঞানের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। মেরীর প্রস্তাবে তিনি খুব খুশি হয়েই তাঁকে দরকারি যন্ত্রপাতি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। মেরী খুব ধৈর্যের সঙ্গে একের পর এক মৌল নিয়ে পরীক্ষা করে গেলেন। শেষে দেখলেন, থোরিয়ামও ইউরেনিয়ামের মত বিকিরণ করে। এর থেকে প্রমাণ হল, এরকম বিকিরণ ধর্ম একা ইউরেনিয়ামের নয়। মেরী এবং পিয়ের কুরী এই ঘটনার নাম দিলেন 'তেজস্ক্রিয়তা' (রেডিও-অ্যাকটিভিটি)।

(গ)

মেরী তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে আরও কিছু জানার

জন্য নানারকম পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করে যেতে লাগলেন। একদিন একখণ্ড 'পিচব্লেণ্ড' নিয়ে (যাতে ইউরেনিয়াম আছে) কাজ করার সময় অবাক হয়ে দেখেন এটা ইউরেনিয়াম-থোরিয়ামের চেয়েও শক্তিশালী বিকিরণ দেয়। তিনি বারবার এর বিকিরণ ক্ষমতা মেপে দেখলেন কোন ভুল নেই, ফল সব সময় একই দিচ্ছে। তিনি বললেন, পিচব্লেণ্ডে যত সামান্যই হক নিশ্চয়ই কিছু নতুন অজানা তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে। চোখে না দেখা গেলেও বিকিরণেই তার উপস্থিতির কথা জানা যাচ্ছে।

মেরী এবং পিয়ের দুজনেই এতে খুব উৎসাহিত হয়ে পিচব্লেণ্ডের মধ্যে নতুন অজানা তেজস্ক্রিয় পদার্থটি বের করতে চেষ্টা করলেন। কয়েকমাস পর তাঁরা একটি মৌলের সন্ধান পেলেন। জন্মভূমি পোল্যাণ্ডের নামে মেরী তাঁর নাম দিলেন 'পোলোনিয়াম'। তারও ছ মাস পরে তাঁরা পিচব্লেণ্ডের মধ্যে আরও একটি নতুন মৌল আবিষ্কার করলেন যা পোলোনিয়ামের চেয়েও শক্তিশালী বিকিরণ দেয়। তাঁরা এর নাম দিলেন রেডিয়াম।

কুরী দম্পতি কিন্তু পিচব্লেণ্ড থেকে বিশুদ্ধ রেডিয়াম বের করতে গিয়ে খুব সমস্যার মধ্যে পড়লেন। কেননা, পিচব্লেণ্ডে এত অল্পই রেডিয়াম আছে যে, খুব সামান্য বিশুদ্ধ রেডিয়াম পেতে গেলেও কয়েকশ' পাউণ্ড পিচব্লেণ্ড নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে এবং তা করতে গেলে কুরীরা যে ছোট ঘরটিতে কাজ করছিলেন তাতে হবে না, আরও বড় ঘর দরকার। শেষে পিয়ের যেখানে কাজ করছিলেন সেই 'স্কুল অব্ ফিজিক্স'-এর একটা উঠোনের ছোট ঘরে তাঁরা জায়গা পেলেন।

ঘরটির মেঝে মাটির, ঠাণ্ডাও প্রচণ্ড, বৃষ্টি হলে ছাদ চুইয়ে জল পড়ে। একটা ভাল ল্যাবরেটরি বলতে যা বোঝায় ঘরটি মোটেই তা ছিল না। তা সত্ত্বেও, মেরী তাঁর স্বামীর সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনগুলো সেখানেই কাটিয়েছেন।

কয়েক হাজার পাউণ্ড পিচব্লেণ্ড নিয়ে পরীক্ষা করার পর তাঁরা চার বছর পরে ০·১ গ্রাম বিশুদ্ধ রেডিয়াম বের করেন। প্রায় ৪৫০ গ্রামে ১ পাউণ্ড হয়, এই কথাটা মনে করলে কী বিপুল পরিমাণ পিচব্লেণ্ড থেকে কত সামান্য বিশুদ্ধ রেডিয়াম তাঁরা পেয়েছিলেন তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। মেরী এই অল্প পরিমাণ রেডিয়াম নিয়েই তার গুণাগুণ পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন, এর তেজস্ক্রিয়তা সমান পরিমাণ ইউরেনিয়ামের চেয়ে দশলক্ষ গুণেরও বেশি!

পরমাণু সম্পর্কে নানা বিষয় জানতে এবং ক্যানসারের মত রোগের চিকিৎসায় রেডিয়াম কাজে লাগে।

রেডিয়াম এবং তেজস্ক্রিয়তা নিয়েই মেরী সারা জীবন কাজ করেছেন। ১৯০৬ সালে তাঁর স্বামী গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা গেলে তিনি একাই একাজ করে যান এবং বিজ্ঞানে আরও নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেন।

কুরীরা পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করার পর অল্পদিনের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা আরও কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানীরা যা ভেবেছেন তার চেয়েও যে বেশি তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে সে বিষয়ে কারও আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলো না।

ভাষান্তক ঃ—লুব্ধক

রঘুবীরকে অবশ্য এখন আর বলার দরকার হয় না—ঠিকঠাক নিয়ম মতোই ও আলো নেভাবে, চেম্বারে দরজা বন্ধ করবে, তারপর চাবি পৌঁছে দিয়ে আসবে গাড়িতে।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে মালহোত্রা একটা সিগারেট ধরালেন। বহু রোগীকে তিনি নিজেই উপদেশ দেন সিগারেট ছাড়বার, কিন্তু নিজে এই নেশাটি এখনো ছাড়তে পারেননি। সংখ্যায় অবশ্য অনেক কমে এসেছে—ছেড়েও দিতে হবে বোধহয় খুব শিগ্‌গির। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল, এখন আরো বেশি সাবধান হওয়া দরকার।

স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে অপেক্ষা করছিলেন, রঘুবীর চেম্বারের চাবি এগিয়ে দিয়ে সেলাম জানাল। অ্যাকসিলেটরে চাপ দিলেন মালহোত্রা।

যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। ছোটখাটো পান-বিড়ির গুমটি ছাড়া বেশির ভাগ দোকানপাটই বন্ধ হয়ে গেছে। দুটো একটা গাড়ির হেডলাইট কখনো এগিয়ে আসছে সামনে, চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। মোড় ঘুরে একটা ট্রাম দেখতে পেলেন—তিন চোখে রাজ্যের ঘুম নিয়ে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণের দিকে। জানলার কাচটা সামান্য নামিয়ে সিগারেটের শেষাংশটুকু বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে দুটো হাতই তিনি তুলে দিলেন স্টিয়ারিং-এ।

পেছনের সীটের তলা থেকে তখন অত্যন্ত আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছিল সে। সামনের আয়নায় ছবি না পড়ে এইভাবে লঘু ভঙ্গীতে সন্তর্পণে সে বাঁদিকে সরে এসেছে। একটুও শব্দ না করে সীটের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে সে।

গাড়ির আলোয় এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাকে। বয়স মোটেই বেশি নয়, বাইশ তেইশ বছরের যুবক বলা যায়। কালো টান টান চামড়া। মাথার চুল নিগ্রোদের মত কোঁচকানো। কিন্তু নাকটা বেশ খাড়া ধরণের—যদিও ডগাটা একটু বেঁকানো। সবচেয়ে আশ্চর্য তার চোখ দুটো। অদ্ভুত উজ্জ্বল, অথচ কি ভীষণ স্থির। পরণে নীল রঙের গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার্স আর সেই একই রঙের পুরোহাতা গলাবন্ধ সোয়েটার। চোখের দৃষ্টি মালহোত্রার দিকে নিবদ্ধ রেখে স্থিরভাবে ট্রাউজার্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা হিমশীতল ধাতব নল স্পর্শ করল সে।

গাড়ি রাসবিহারী এভিনিউ ছাড়িয়ে এল। দিনের বেলা এখানটা পেরুতে গিয়ে বিরক্তি ধরে যায়—খোঁড়াখুঁড়ি করে যেটুকু রাস্তা অবশিষ্ট আছে তাতে বাস ট্রাম ট্যাক্সি লরি সব যেন একেবারে জমাট বেঁধে থাকে, কচ্ছপের মত থপ থপ করে এগোয় আর থমকে দাঁড়ায়। এখন অস্পষ্ট আলোয় জায়গাটা পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মত ফাঁকা পড়ে আছে। মনে মনে একটু হেসে গাড়ীর স্পীড বাড়াতে যাচ্ছিলেন মালহোত্রা, ঠিক সেই সময়—

হ্যাঁ, ঠিক সেই মুহূর্তে পিঠে একটা কঠিন বস্তুর স্পর্শ পেয়েছেন তিনি, সেই সঙ্গে ভেসে এসেছে এক ভারি কণ্ঠস্বর। শান্ত অনুত্তেজিত ভঙ্গীতে ইংরেজিতে পেছন থেকে সেই কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, 'পেছনে তাকাবার চেষ্টা করবেন না, গাড়ি থামান।'

একটা হিমশীতল প্রবাহ মালহোত্রার মাথার মধ্যে যেন আছড়ে পড়ল। মাথা থেকে সেই তরল প্রবাহ ছড়িয়ে গেল সমস্ত দেহে। ভাল করে কিছু চিন্তা করবার শক্তিও যেন হারিয়ে গেল

ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট

লিট্‌ল সায়েন্টিস্ট ক্লাবের নাম শোননি তোমরা? সেই যে গতবছর ন্যাশনাল সায়েন্স এক্সিবিসনে দারুণ চমৎকার দুটো মডেল তৈরী করে যারা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল—তাদের কথা বলছি। ডিংকু, টিংকু, মৌ, হাসুবানু, চন্দ্রভানু, বাবুল-মিঠুন, লবু-কুশু-এরা হচ্ছে লিট্‌ল সায়েন্টিস্ট ক্লাবের আজীবন সদস্য। এদের বয়স 'সাত থেকে' তের বছর। এই ক্লাবের সভাপতি হচ্ছেন ওদের সবার প্রিয় ছোটমামা।

ও-হো, বলতে একেবারে ভুলেই গিয়েছি—এই ক্লাবটা কিন্তু কোনও পাড়ার অথবা কোনও দলের নয়। এটা একেবারেই ওদের পারিবারিক বিজ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র। সবে মাত্র এক বছর আগে এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

তুমি হয়ত মনে মনে ভাবছ—একবার ঘুরে এলে মন্দ হোত না লিট্‌ল সায়েন্টিস্ট ক্লাবে। বাড়ীর সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে দেখবে বিজ্ঞান ক্লাবে যাবার পথের নির্দেশ তীরচিহ্ন দিয়ে এঁকে রাখা হয়েছে। সদর দরজা পেরিয়ে ডানদিকে সিঁড়ির উপরের অংশে তীরচিহ্ন দিয়ে লেখা হয়েছে—'এই পথে লিট্‌ল সায়েন্টিস্ট ক্লাব আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।' তোমাকে সোজা দোতলায় উঠে বড় হলঘরটা পেরিয়ে এবার বড়মামার পড়ার ঘরের সামনে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। একটু সাবধানে পা ফেলে এগুবে। বড়মামার মেজাজ সুবিধার নয়। পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটালে মাথায় গাট্টা অথবা কানমলা খাবার ভয় যথেষ্ট। ওঁর ঘরের আশেপাশে কোনও নিশানা দেওয়া নেই। ভাগ্নে-ভাগ্নীর দল কেবল শুধু—'Silence, গোলমাল একদম বন্ধ'—এই কটি কথা লিখে রেখেছে। এবার আর কোনও অসুবিধা নেই। সোজা তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেই ছাদের ডানদিকে ও বাঁ দিকে দুটো ঘর দেখতে পাওয়া যাবে। দরজার সামনে বড় বড় হরফে লেখা আছে—LABORATORY, তার নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা—ট্রেসপাসার্স উইল বি প্রসিকিউটেড'। এর অর্থ হ'ল অনধিকার প্রবেশকারীরা শাস্তি পাবে।

কি নেই এই ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের ল্যাবরেটরীতে? ম্যাগনেট, ট্রানসিসটর, এ্যামিটর, ভোল্টমিটার, ছোট্ট রেডিও সেট, ট্রান্সফরমার, কনডেনসার, থার্মোমিটার, নানাধরণের এ্যাসিড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, স্পিরিট ল্যাম্প, লেন্স, সেলোফেন পেপার, ব্যাটারী, ম্যাগনেটিক কম্পাস,—আরও কত কি যে তা বলে শেষ করা যাবে না। টেবিলের উপর রয়েছে একটা পুরো ডিস্‌টিলেশন সেট। জলের মধ্যে পটাসিয়াম প্যারম্যাঙ্গানেট দিয়ে জলকে পাতন প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ

করা হচ্ছে। তার পাশেই রয়েছে ছোট্ট একটি ষ্টীম এঞ্জিনের মডেল। এঞ্জিনের বয়লারের মধ্যে জল দিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে ওটাকে গরম করলেই বাষ্প পিষ্টনকে ঠেলা মেরে চাকাকে ঘুরিয়ে দেবে। বাবুল এই মডেলটা তৈরী করে ওদের স্কুল থেকে এবার ফাস্ট প্রাইজ পেয়েছে। ওই ষ্টীম এঞ্জিনের পাশে দেখতে পাবে ডিংকুর নিজের হাতে তৈরী ছোট্ট রেডিও সেট।

এইসব ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা নানাধরণের মডেল তৈরী করার কায়দাটা শিখেছিল ওদের ছোটমামার কাছ থেকে। ছোটমামা নিজে একজন নামকরা বিজ্ঞানী। এছাড়া শিশুবয়স থেকে ছোটদের যাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে এজন্য তিনি তাদের হাতে কলমে নানান ধরনের মজার এক্সপেরিমেণ্ট আর সুন্দর সুন্দর মডেল তৈরী করে দেখান। অবশ্য ছোটরা নিজেরাই এখন অনেক চমৎকার মডেল তৈরী করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। রবিবার, ছুটির দিন, পূজোর ও গরমের ছুটির দিনগুলিই হচ্ছে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রকৃষ্ট সময়। ঠাকুমার ছাদের পূজোর ঘরের একটা অংশ পার্টিসন করে সেটাকে ওরা লাইব্রেরী বানিয়েছে। **বিজ্ঞান মেলা, সায়েন্স ডাইজেস্ট, পপুলার সায়েন্স, স্পুটনিক, পপুলার মেকানিক্স**—এসব পত্রিকা তো রয়েছেই। এছাড়া ইদানিং ছোটমামার দৌলতে **সায়েণ্টিফিক আমেরিকান ও ইলাসট্রেটেড লণ্ডন** পত্রিকাও ওরা মাঝে মাঝে পাচ্ছে। সব মিলিয়ে বিজ্ঞান বইয়ের সংখ্যা হবে প্রায় আড়াইশোর মতন। সায়েন্স এনসাইক্লোপেডিয়া ও কিছু মডেল তৈরী করবার বইও ওদের লাইব্রেরীতে রয়েছে।

আমি কিছুদিন আগে লিট্‌ল সায়েন্টিস্ট ক্লাবে গিয়েছিলাম। আমার ভারী ভাল লেগেছে ছোট্ট বিজ্ঞানী বন্ধুদের চমৎকার 'বৈজ্ঞানিক মডেলগুলো দেখে। তোমাদের এখানে সেইসব মডেল তৈরী করার কথাই বলব।

হ্যাঁ, আরও একটা কথা এখানে বলা দরকার। তোমরা এইসব মডেল তৈরী করার সময় খুব সাবধানে কাজ করবে। প্রয়োজন মনে করলে বড়দের পরামর্শও নিতে পার। এখানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রোজেক্টর যে সব মডেল তৈরীর কথা আমরা বলব—সেগুলোর বেশির ভাগই হাতের কাছে যে সমস্ত জিনিষপত্র পাওয়া যায় তাই দিয়ে তৈরী করা যাবে। ফেলে দেওয়া, ভাঙ্গা, অকেজো অনেক জিনিষকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে তার থেকে সুন্দর সুন্দর মডেল তৈরী করা যায় তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমার স্থির বিশ্বাস লিট্‌ল সায়েন্টিস্ট ক্লাবের ক্ষুদে বৈজ্ঞানিকদের মতো তোমরাও এইসব মডেল অনায়াসে তৈরী করতে পারবে।

একটা মডেল তুমি হয়ত তৈরী করলে—কিন্তু দেখা গেল কোনও কারণে সেটা ঠিক মতো কাজ করছে না। আবার চেষ্টা কর, দেখবে তখন নিশ্চয়ই কাজ করবে। তোমার নিজের হাতে তৈরা মডেল দেখে ছোট বড় সবাই কেমন অবাক হয়ে যাবে!

ডিস্‌টিলেশন মডেল

'ডিস্‌টিলেশন'—এর বাংলা অর্থ হচ্ছে পাতন প্রক্রিয়া। পাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা জলকে বিশুদ্ধ করে থাকি। বিশুদ্ধ জল তো আমাদের সব সময়েই চাই। জলের আর এক নাম জীবন। জল না হলে আমাদের এক মুহূর্তও চলে না-বাসন মাজতে, কাপড় কাচতে, রান্না করতে এবং পান করার জন্যে জল অবশ্যই চাই। জলের মধ্যে অনেক সময়

নানাধরণের জীবাণু থাকে। এই জীবাণুরাই রোগ ছড়ায়। তাই পান করবার জন্য জল সব সময় বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। জলকে বিশুদ্ধ করতে হলে আমাদের যে সমস্ত জিনিষপত্র চাই তা হ'ল—ফ্লাস্ক, কর্ক, কর্ক ফুটো করার যন্ত্র—কর্ক বোরার, একটা তিন পায়াওয়ালা লোহার অথবা টিনের ষ্ট্যাণ্ড, বেঁকানো গ্লাস টিউব দেড় ফুট, স্পিরিট ল্যাম্প, স্পিরিট, ছোট একটা কাচের জার অথবা ওষুধের শিশি।

কাচের ছোট ফ্লাস্ক জোগাড় করতে পারলে ভাল। না হলে পুরণো ফিউসড্ বাল্ব-এর উপরটা কোনও কাচের দোকানে গিয়ে ছবিতে যেমন দেখানো

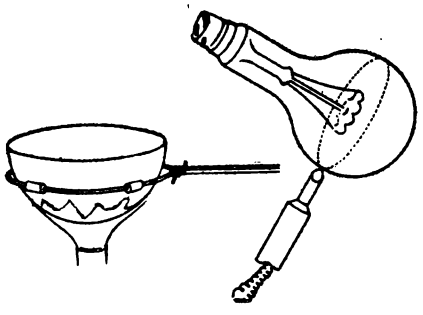

হয়েছে ঠিক সেইভাবে কাটিয়ে নেবে। ব্যস, তাহলেই তোমার ফ্লাস্ক তৈরী হয়ে গেল। পুরণো বাল্ব থেকে অবশ্য কাচের বাটি বা বেসিন তৈরী করাও যায় (ছবি দেখ)। ফ্লাস্ক তৈরী করতে হলে বাল্বের ঘাড়ের কাছে আরও উপর থেকে কাটতে হবে।

এবার ঐ ফ্লাস্কের মুখে ফিট্ করে এমন একটা শোলার কর্ক (যার মাঝখানে গ্লাসটিউব ঢোকাবার জন্য গোল ফুটো করা হয়েছে) খুব সাবধানে বসিয়ে দাও। একটা দেড় ফুট গ্লাস টিউবের দুই পাশ একদিকে তিন ইঞ্চি ও অন্যদিকে পাঁচ ইঞ্চি করে বেঁকিয়ে নিতে হবে। যারা কাচের কাজ করেন তাদের বললেই ওরা ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইরকম দু'দিক বেঁকানো কাচের নল তৈরী করে দেবেন। কি করে গ্লাস টিউবকে নরম করে বেঁকাতে হয় তা একবার শিখে নিলে তোমরাও পরে তা সহজেই করতে পারবে।

এবার আমাদের দরকার একটা স্পিরিট ল্যাম্প। ওটা পাওয়া না গেলে একটা পুরণো কালির দোয়াত যোগাড় করে তার থেকেও এই ল্যাম্প তৈরী করা যায়। দোয়াতের টিনের ঢাকনার ঠিক মাঝখানে গোল করে ৮ থেকে ১০ মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত একটা ফুটো করতে হবে। একটা পাতলা পুরণো টিনের কৌটো থেকে ২.৫ সেন্টিমিটার চওড়া ও ৪ সেন্টিমিটার

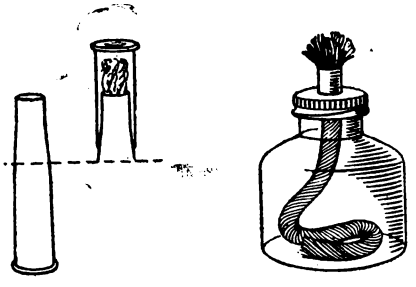

লম্বা পাত কেটে নাও। এবার পাতটা গুটিয়ে রোল করে একটা টিউবের মতো কর। যেন ওটা দোয়াতের কৌটোর মুখের ফুটোর মধ্যে ঠিক ভাবে বসতে পারে (ছবি দেখ)। মনে রাখবে দোয়াতের মধ্যে যেন ওটা ১ সে.মি. পর্যন্ত ঢুকে থাকে। এরপরের কাজ খুবই সহজ। একটা ওই মাপের পলতে বাজার থেকে কিনে নিয়ে অথবা পুরণো ন্যাকড়া ছিঁড়ে পলতে বানিয়ে নিয়ে ঐ টিউবের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই তোমার স্পিরিট ল্যাম্প তৈরী হয়ে গেল। পলতেটাও বেশ বড় হওয়া চাই যাতে দোয়াতের নীচের দিকেও অনেকটা পড়ে থাকে।

পুরণো জুতোর পালিশের কৌটো দিয়েও সাধারণ একটা ল্যাম্প তৈরী করা যায়। একটা পাতলা টিনের

কৌটো থেকে আগের মতো খানিকটা পাত কেটে সেটা রোল করে নিয়ে মাঝখানে ঝালাই করে

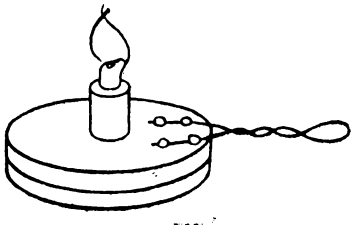

নিতে পার। একটা তারও ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে সেইভাবে ঝালাই করে নিয়ে ঐ ল্যাম্পের হাতল তৈরী করা চলে।

লোহার তিনপায়া ষ্ট্যাণ্ড পাওয়া গেলে ভাল। যদি না পাওয়া যায় তবে বড় টিনের কৌটো নিয়ে তার

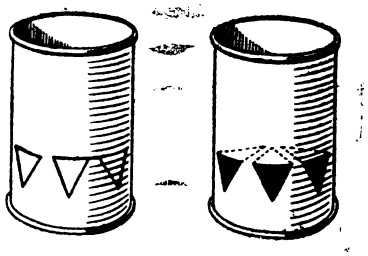

নীচের অংশ থেকে (ছবি দেখ) ত্রিভুজের মতো করে কেটে তিনটে জানালা তৈরী করতে হবে। দেখবে, কৌটোর মুখে যেন তোমার বাল্বের তৈরী ফ্লাস্ক ঠিকমতো বসতে পারে। অথবা টিনের কৌটোর নীচ থেকে কেটে নিয়েও তিনপায়া ষ্ট্যাণ্ড তৈরী করা

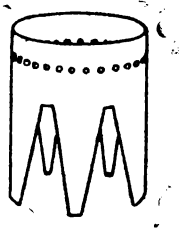

কঠিন নয়। ষ্ট্যাণ্ডের উপর দিকে ছোট ছোট গোল ফুটো করলে সেখান থেকে গ্যাস সহজেই বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে।

এইবার তোমাকে জল বিশুদ্ধ করতে হবে ডিস্‌টিলেসন পদ্ধতিতে। প্রথমে ফ্লাস্কে কিছুটা জল নাও। খুব সামান্য দু'একটা টুকরো পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (যদি হাতের কাছে পাওয়া যায়) ফেলে দাও। দেখবে কেমন সুন্দর জলের রং আস্তে আস্তে গোলাপী হয়ে গেল।

কর্কের ছিপি ফ্লাস্কের মুখে ঠিক করে লাগাও। তারপর ঐ গ্লাস টিউবের ছোট বেঁকানো দিকটা

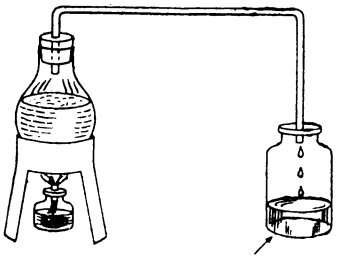

কর্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। টিউবের বেঁকানো বড় দিকটার নীচে একটা পরিষ্কার শিশি রাখতে হবে।

স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে তিনপায়া ষ্ট্যাণ্ডের নীচে বসাও। কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে আর ঐ বাষ্প গ্লাস টিউবের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে ফোঁটা ফোঁটা টল্‌টলে পরিষ্কার জল শিশিতে পড়ছে। শিশির জল এখন বিশুদ্ধ— ইংরাজীতে যাকে বলে ডিসটিলড্‌ ওয়াটার। এই পদ্ধতির নাম হ'ল ডিস্‌টিলেসন বা পাতন প্রক্রিয়া। তোমার নিজের হাতে তৈরী এই ডিসটিলেসন মডেল দেখে ছোটবড় সবাই যে অবাক হয়ে যাবে—তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

পার্থসারথি চক্রবর্ত্তী

শরীর স্বাস্থ্য

দরজার শব্দ !

অপূর্ব্ব ! যা দেখলাম তার তুলনা হয় না।—টিভির পর্দায় সবে শেষ হওয়া 'গুপী-গাইন বাঘা-বায়েন' দেখে মন্তব্য করলো ছোটমামা।

—দিদি, তোর কোন্ জায়গাটা সব থেকে ভাল লাগলো ? টুম্পাকে শুধায় গাবলু।

—আমার তো মনে হয় গুপী আর বাঘার প্রথম দেখা হওয়াটা। ওপর থেকে ঢাকের ওপর জল পড়ে অদ্ভুত আওয়াজ আর দুজনের অভিনয়—দারুণ।

গাবলু বললো—ঢাকের ওপর জলের আওয়াজ, ঠিক যেন হার্টের আওয়াজ মনে হচ্ছিল—তাই না ছোটমামা ? টুম্পা এইফাঁকে জিজ্ঞাসা করলো—হার্ট নিয়ে তুমি তো নানা রকম গল্প বলো ছোটমামা। একদিনও কিন্তু বলো নি হার্টের ঐ ধুক-পুক আওয়াজটা তৈরী হচ্ছে কি করে ?

ছোটমামা হাসলো। হার্ট যদি মিনিটে বাহাত্তর বার ধুক-পুক করে, তাহলে একবারে সময় লাগছে কতটা ? টুম্পা হিসেব করে বললো—এক সেকেণ্ডেরও কম। —হ্যাঁ। ঠিক হিসেবটা হলো দশমিক আট সেকেণ্ড। এর মধ্যে ওপর আর নীচের অংশ সময় ভাগাভাগি করে নিচ্ছে।

—গণ্ডগোলে ফেলে দিচ্ছো মনে হচ্ছে ? —পাশের সোফাটায় ধুপ করে বসে পড়ে টুম্পা।

—গণ্ডগোলের কিছু নেই। গাবলু—হার্টের ঘর কটা ?

—ওপরে দুটো অলিন্দ, নীচের দুটো নিলয়, মোটমাট চারটে। —গাবলুর চট্‌পট্ জবাব।

—কারেক্ট। দশমিক আট সেকেণ্ডের মধ্যে ওপর আর নীচ, দুটো অংশেরই সঙ্কোচন প্রসারণ সেরে ফেলতে হবে। দুজনের হিসেব কিন্তু দু-রকম। গাবলু—তোর মা'কে চায়ের জন্য বল্ গে। তোদের বাবার জন্য দুধ দিয়ে, আমার লেবু-চা। টুম্পা মুচকি হাসলো। —তোমাদের দু-রকম হিসেব তো বুঝলাম। কিন্তু হার্টের বেলা ?

ছোটমামা বললো—ওপর তলায় এক আর সাত। নীচের তলায় হিসেব তিন আর পাঁচ।

গাবলু বললো—অর্থাৎ ?

—ওপরতলায় কুঠুরীগুলোর সঙ্কোচন হতে সময় লাগছে দশমিক এক সেকেণ্ড আর বাকি দশমিক সাত সেকেণ্ড ধরে তারা 'রিল্যাক্স' করছে মানে প্রসারিত হচ্ছে।

—আর নীচের তলায় দশমিক তিন সেকেণ্ডের জন্য সঙ্কোচন, বাকি সময়টা প্রসারণ। তাই তো ? —টুম্পার চটপট উত্তর।

কিন্তু ঐ আওয়াজের ব্যাপারটা ? —ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞাসা করে গাবলু।

হাত তুলে ছোটমামা বললো—আগে বল হার্টের ওপরের ঘরে কোথা থেকে রক্ত আসে ?

—এতো সবাই জানে। গাবলু বললো—এক এক দিকে এক এক রকম। ডানদিকের অলিন্দে যত দূষিত রক্ত এসে জমা হবে বড় বড় শিরা দিয়ে। আবার বাঁ দিকে ফুস্‌ফুস্ থেকে অক্সিজেনওয়ালা রক্ত আসবে।

ছোটমামা বলল—হ্যাঁ। দশমিক সাত সেকেণ্ড ধরে ওপরের কামরাগুলো যখন প্রসারিত হচ্ছে, তখন ঐ ব্যাপারগুলো ঘটছে। পরের দশমিক এক সেকেণ্ডে ওরা সঙ্কুচিত হবে, মানে পিচকিরির মতো ঠেলে রক্তকে পাঠিয়ে দেবে নীচের ঘরে।

টুম্পা জিজ্ঞাসা করলো—নীচের ঘরের অবস্থা তখন কি ?

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে ছোটমামা বলল—হুড়হুড় করে রক্ত ঢুকছে ঘরে, নীচের ঘরের সঙ্কোচন শুরু হলো। প্রথম কাজ রক্ত ঢোকা বন্ধ করা, দড়াম করে দরজা বন্ধ হলো। ঐ হলো হার্টের প্রথম শব্দ।

গাবলু বললো—দরজাটা আবার কোনটা ?

ছোটমামা বললো—কেন যে দুটো রাস্তা দিয়ে ওপর থেকে নীচে রক্ত আসছিল, সেই অলিন্দ আর নিলয়ের মাঝের দরজার ভালভ্—তারই শব্দ এটা।

টুম্পা বললো—এই ভালভের নাম কি ?

—নামগুলো খট্‌মটে, মাইট্রাল, ট্রাইকাসপিড, এই-সব। ছোটমামা হাসল।

—ও, তাহলে যে মাইট্রাল স্টেনোসিস' কথাটা শুনি, সেটা এই ভালভের গণ্ডগোল ? —টুম্পার জিজ্ঞাসা।

—ঠিক তাই। কোন কারণে এই ভালভ্ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেলে ঠিকমতো কাজ করে না। তার থেকেই ঐ অসুখ। যাক গে, যে কথা বলছিলাম ; তলার ঘরে সঙ্কোচন যতো হবে, রক্তও বাঁদিক থেকে মহাধমনী দিয়ে শরীরে আর ডান দিক থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-ওয়ালা রক্ত ফুস্ ফুসে যাবে। তাই তো ? এই রাস্তার মুখে আধখানা চাঁদের মতো চেহারার ভালভ্ থাকে। নিলয়ের চাপে তারা খুলে যায়।

টুম্পা জিজ্ঞাসা করলো—তখনই কি আমরা পরের আওয়াজটা শুনতে পাই ?

ছোটমামা বলল—না। যেই নীচের ঘরগুলো প্রসারিত হতে আরম্ভ করলো, ঘরের মধ্যেকার রক্তের চাপ গেল কমে। তখন মহাধমনীর রক্তরা চেষ্টা করবে আবার নীচের ঘরে ফিরে আসতে।

গাবলু বলল—পা পিছলে গেলে যেমন হয়।

ঠিক বলেছিস্। —ছোটমামা হাসলো। পেছন থেকে এই ধাক্কা খেয়ে ঐ অর্ধচন্দ্রাকার ভালভ্গুলো দড়াম করে বন্ধ হলো। সেটাই আমরা কানে স্টেথো লাগিয়ে দ্বিতীয় শব্দ হিসেবে শুনতে পারছি।

টুম্পা বললো—তাহলে আমরা হার্টের যে ধুকপুক শব্দ পাই সেটা স্রেফ ভালভ্ বন্ধের আওয়াজ ? ছোটমামা চায়ের কাপটা টেনে নিতে নিতে বললো—আওয়াজ দুটো নয়, চারটে। বাকি দুটো সাধারণত শোনা যায় না। নিলয় যখন প্রসারিত হতে আরম্ভ করে, সেই সময় প্রথমটা রক্ত হুড়হুড় করে ছোটে, সেখানেও একটা আওয়াজ হতে পারে। বাচ্চাদের বেলায় অনেক সময় এই আওয়াজটা পাওয়া যায়। এর পর নিলয়ে আস্তে আস্তে রক্ত জমা হতে থাকে, তখন কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না। নিলয়ের প্রসারণ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, উপরের ঘরে সঙ্কোচন শুরু হয়ে যায়, ফলে রক্ত আবার হুড়্মুড় করে ছোটে। এতে আর একটা আওয়াজ হয়। অবশ্য এই শেষের দুটো আওয়াজ অনেক সময়ই শোনা যায় না।

গাবলু এতক্ষণ চুপচাপ ছোটমামার কথা শুনছিল। এবার মোক্ষম প্রশ্নটি ছুঁড়লো ছোটমামার দিকে—যখন জানাই আছে হার্টের কোন্ আওয়াজ কখন্ শোনা যায়, অত নিবিষ্টভাবে বুকে স্টেথো লাগিয়ে কি অত শোনো ?

ছোটমামা বললো—মজা তো ঐখানেই। কোনো কারণে যদি ভালভের কোনো গণ্ডগোল হয়, বা মহাধমনী বেলুনের মতো ফুলে যায় কিংবা হার্টের মধ্যে দিয়ে রক্ত চলাচল একটু এলোমেলো হয়ে যায় তাহলে শব্দের স্থায়িত্ব বা কিছু কিছু ধর্ম পাল্টে যায়। অবশ্য আজকালকার দিনে নানারকম যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে যা দিয়ে হার্টের আওয়াজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু সেসব যন্ত্র তো আর আমাদের কাছে সবসময় থাকে না, সুতরাং একমনে স্টেথো লাগিয়ে আওয়াজ না শুনলে চলবে কেন বল্ ?

সুভাষ সান্যাল

বই মেলায় **'বিজ্ঞান মেলা'** পাওয়া যাচ্ছে।
কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, গ্রন্থনা ও উৎস মানুষের ষ্টলে।
তোমরা ইচ্ছা করলে ওখান থেকে সরাসরি গ্রাহকও হতে পার।

অবিশ্বাস্য!

(১)

কথায় বলে কাঁচের মতো ঠুনকো! সত্যিই তো তাই। কাঁচের জিনিষ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। কোথায় একটু জোরে ঠোকা লাগলো কি হাত ফস্কে গেল ব্যাস্। ভেঙ্গে খান্ খান্। কিন্তু এমন কাঁচও আছে যা কি-না হাতুড়ী দিয়ে দমাদ্দম্ ঘা দিলেও কিছুটি হবে না! অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে? ঘটনাটা বলি শোন।

১৯৪৯ সাল। ডঃ স্টুকে নামে এক রসায়নবিদ্ কাঁচের প্লেটের ওপর ছবি তোলার সহজ উপায় নিয়ে গবেষনা চালাচ্ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি কাঁচ তৈরীর বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে গরম করছিলেন। বিশেষ কারণে সেদিন তাঁর বাড়ী ফেরার তাড়া ছিল। রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে ডঃ স্টুকে তাড়াহুড়ো করে ল্যাবরেটরী বন্ধ করে বাড়ী চলে গেলেন। এদিকে হয়েছে কি — যে উনানের ওপর কাঁচ তৈরী হচ্ছিল, সেই ৬০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উনান সারারাত্রি চালু থেকেই গেল!

পরদিন ডঃ স্টুকে ফিরে এসে দেখেন উনান জ্বলছে। সারারাত্রি অতিরিক্ত তাপ পেয়ে মিশ্র উপাদানগুলো কাঁচের মতো স্বচ্ছ একধরণের জিনিষে রূপান্তরিত হয়ে বসে আছে। আসলে বিজ্ঞানী চাইছিলেন কম-তাপমাত্রায় রেখে কাঁচ তৈরী করতে যা দিয়ে তাঁর কাজ হবে। অথচ বেশী তাপ পেয়ে এটা সাধারণ কাঁচ তৈরী হয়ে গেছে। এ দিয়ে তো আর কাজ হবে না, সুতরাং স্টুকে কাঁচের বলটাকে কোণের আবর্জনা ফেলার পাত্রে ছুঁড়ে দিলেন। অথচ অবাক কাণ্ড — কাঁচের বলটা না ভেঙ্গে স্রেফ রবারের বলের মতো লাফিয়ে উঠল। স্টুকে ভাবলেন এটা কেমন হোলো? আবার দেখি তো? উঁচু থেকে ফেললেন — তাও ভাঙ্গলো না। দেওয়ালে ছুঁড়লেন, হাতুড়ী পেটালেন, কিছুতেই এটা ভাঙ্গার নয়।

কাঁচের ওপর ছবি তোলার কাজ মাথায় উঠল — স্টুকে নতুন করে গবেষণা শুরু করলেন, কি ভাবে এই কাঁচ তৈরী হলো? অক্লান্ত তিন বছরের গবেষণার ফলে তৈরী হলো এই নতুন ধরণের — কাঁচ 'পাইরো-সেরাম' যা কি না লোহার থেকেও শক্ত। শুধু তাই না, এটা অ্যালুমিনিয়ামের থেকে হাল্কা, লোহা গলানো উত্তাপে গলে না, প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চাপ সইতে পারে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড!

ডঃ স্টুকের আবিষ্কার মার্কিন মহাকাশ সংস্থার সামনে এক নতুন রাস্তা খুলে দিল। আজকের প্রচণ্ড তাপ ও চাপবাহী যে সব জিনিষ নিয়ে মহাকাশযানের অংশ তৈরী হচ্ছে তাদের পূর্ব্বপুরুষ ঐ পাইরোসেরাম।

(২)

শুঁয়োপোকারা বোলতাদের ভীষণ ভয় পায়! কারণ বোলতারা শুঁয়োপোকাদের ছেলেধরা! কোন কোন জাতের বোলতারা ডিম পাড়ার সময় হলে প্রথমে মাটি দিয়ে ছোট ছোট কুঠুরী বানিয়ে নেয় — গাছের গুঁড়িতে বা পুরোণো দেওয়ালের গায়ে। তারপরে বেরিয়ে পড়ে শিকারের খোঁজে। ছোটখাট শুঁয়োপোকা বা ঐ ধরণের কোন পোকা দেখলেই — ব্যাস! সিরিঞ্জের মতো হুল ফুটিয়ে তাকে বেহুঁশ করে সোজা এনে তোলে মাটির তৈরী কুঠুরীতে। তারপর? স্রেফ ঐ অজ্ঞান শুঁয়োপোকার গায়ে ডিম পেড়ে, মাটি দিয়ে কুঠুরীর মুখ বন্ধ করে মা বোলতা উধাও! ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরিয়ে ঐ মরা শুঁয়োপোকা খেয়ে বড় হয় — তারপর মাটি কেটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তোমরা যারা একটু গ্রাম গঞ্জের দিকে থাকো, 'কুমোরে-পোকা' দেখেছো নিশ্চয়! এদের গতিবিধি নজর করলে এই অবিশ্বাস্য ঘটনা তোমরা নিজের চোখে দেখতে পাবে!

বঙ্কুবাবুর গল্প

বিমলেন্দু মিত্র

রেডিওতে ক্রিকেটের রিলে শেষ হল। হাত বাড়িয়ে সুইচ্‌টা বন্ধ করে দিয়ে মোগলাই পরটার ডিশ্‌ টেনে নিয়ে বঙ্কুবাবু বললেন,—"আমাদের হরমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাশ নাইনে পড়বার সময় সেই যে ক্রিকেট খেলা দেখেছিলুম, তারপর থেকে অন্য ক্রিকেট আর চোখে লাগে না, এমন কি কানেও ভাল লাগে না।"

আট বছরের বুড়ি ঘাড় নেড়ে বললে,—"আমারও না।"

তপেশ পরবর্তী ঘটনা আন্দাজ করে ব্যাজার মুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। পরটা শেষ হয়েছিল। বঙ্কুবাবু সুরু করলেন,—আমাদের সময়ে যে সব বাঘা বাঘা মাষ্টারমশাই ছিলেন তেমন আজকাল আর দেখা যায় না। অঙ্ক স্যার গজেনবাবু, ভূগোল-বিজ্ঞানের ভূপেশবাবু, এঁদের মত স্যার আজকাল আর জন্মায় না। ধর আমাদের ড্রিল মাষ্টার-মশাই শশীবাবু। অমন তাগড়াই চেহারাই আজ-কাল চোখে পড়ে না। শশীবাবুর ফেবারিট খেলা ছিল ফুটবল কিন্তু ক্রিকেটেও ওস্তাদী ছিল কম নয়। ওঁর কোচিংএ আমাদের টিম ইস্কুল লীগে ফাটাফাটি করে দিত।

আমাদের টিমে আসল ওস্তাদ ছিল আমাদেরই ক্লাসের পাঁচু আর উদো। ওরা দুজনেই স্পিনার, কিন্তু পাঁচুর ব্যাপারটা ছিল আলাদা। ও দারুণ ফাষ্ট বল করত আবার ঐ ফাষ্ট বলেই কড়া আঙ্গুলের মোচড়ে ধরিয়ে দিত স্পিন। সে যে কিরকম স্পিন সেই গল্পই আজ করব।

সেবারে কাদাপাড়ার কুমার ভবতোষ ইনষ্টি-টিউসন আর আমাদের বাহির শুঁড়োর হরমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের পোজিশান ব্রাকেটে সেকেণ্ড। আগের খেলায় দেশবন্ধু সেমিনারীকে এক ইনিংস আর একাত্তর রানে হারিয়েছি।

কিন্তু কুমার ভবতোষ দুঁদে টিম। আমাদের হারাতে পারলেই ওরা সেবারে নির্ঘাৎ চ্যাম্পিয়ন।

সরস্বতী পূজোর আগের দিন পর্যন্ত খেলাটা গড়াতে পারে জেনে মনটা ভাল নেই। পদ্মলোচন

শশীবাবুকে বললে—"স্যার, যদি দুটো ইনিংস পুরো খেলতে হয় তবে ঠাকুর সাজানোর জন্যে রাত্তির জাগতে পারব না।"

স্যার বললেন,—"গাঁট্টা খাবি পদ্ম, মাথা ফুটো করে দেব। কুমার ভবতোষ লড়িয়ে টিম। অবশ্য ওদের যদি ইনিংস ডিফিট দিতে পারিস তবে ভাসানের পরদিন পোলাও মাংস।"

সেদিন ইস্কুল মাঠে প্র্যাকটিসের সময়ে পাঁচু বল করছিল। লাল আগুনের গোলার মত ওর স্পিন ধরান ফাষ্ট বল কেউই আমরা ভাল খেলতে পারি না। এদিক ওদিক ছট্‌কে মাথা বাঁচাই। ভাগ্যিস ও অ্যাকিউরেট নয়। উইকেট ছুঁতে পারে না। কিন্তু পালিশ-চটা বলে যখন সাংঘাতিক স্পিন ধরায় তখনই অফসাইড থেকে বল তিনহাত ভেতরে ঢুকে আসে। ব্যাট ছোঁয়ালে গোঁত্তা খেয়ে তিড়িং করে সাড়ে চারহাত লাফিয়ে ওঠে বল। তক্ষুনি টুপুস্ করে ক্যাচ। হাউজ্ দ্যাট?

আমি তখন প্র্যাক্‌টিস্ ম্যাচে পাঁচুর বলেই কট্ আউট হয়ে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে। শশীবাবু চেঁচিয়ে পাঁচুকে ডিরেকশান দিচ্ছেন ষ্টাম্প্ লক্ষ্য করে বল ছাড়তে। হঠাৎ পেছনে শোনা গেল,—"শশী, পঞ্চানন যে বল করছে তা কি শ্লো বল?" চেয়ে দেখি পেছনেই ভূপেশবাবু স্যার। ইস্কুল মাঠে এসে উনি মাঝে মাঝে হাওয়া খান।

ছেলে ভুলোনোর মত করে শশীবাবু বললেন,—"দাদা, ও হল মিডিয়াম ফাষ্ট অফ্ স্পিনার।"

ভূপেশবাবু গোঁফের দুপাশ মুখের মধ্যে পুরে চিবিয়ে নিয়ে বললেন,—"অ। তা ও ঘোরাচ্ছে কি? হাত না বল?"

শশীবাবু স্পিনের ব্যাপারটা স্যারকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,—"ওর স্পিন বল অফ্ দিয়ে বেরিয়ে যায়, ব্রেক খেলে ভেতরে ঢোকে, সরাসরি ষ্টাম্প্ ছুঁতে পারে না।"

ভূপেশবাবু স্যার চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু করে বললেন,—"যদিও আমি ক্রিকেট খেলি না তবু পঞ্চাননের সব বল যাতে উইকেট ছোঁয় সে ব্যবস্থা আমি করতে পারি।" আমরা অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চাইতেই উনি লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললেন,—"স্পিন কথাটা শুনেই আমার একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করতে ইচ্ছে করছে। তা তোমরা বলছ পঞ্চাননের স্পিন মন্দ নয়?"

শশীবাবু ভূপেশবাবুর দিকে চেয়ে থেকে তারপর বাজখাঁই গলায় ডাকলেন,—"বয়েজ্, ষ্টপ্ প্র্যাক-টিস্, এদিকে এস সবাই!"

ভূপেশবাবু বললেন,—"আগে পঞ্চাননের স্পীড্ মাপতে হবে।"

পরদিনের কথা। ছোট ছেলেরা যেমন চাকা লাগানো কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলা করে ঠিক তেমনি একটা কাঠের গাড়ি জোগাড় হয়েছে। ওটার ওজন নেওয়া হল সাবধানে। বলের ওজন ১৫০ গ্র্যাম। উইকেটের জায়গায় গাড়িটা রেখে পাঁচুকে বললেন—"ঐ ঘোড়ার গায়ে বল লাগাও পঞ্চানন।" ওভারের পঞ্চম বলটা সজোরে লাগতেই ঘোড়াটা হড় হড় করে পিছিয়ে গেল। কতটা পিছুলো স্যার স্কেল ফেলে তা মাপলেন। মুচ্‌কি হেসে বললেন,—"তা পঞ্চানন বেশ জোরেই বল করে হে। হিসেবে দাঁড়াচ্ছে ঘণ্টায় ১০০ কিলো-মিটার।"

শশীবাবু সোৎসাহে বললেন,—"বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বুঝলে বয়েজ্, বিজ্ঞান!"

ভূপেশবাবু বললেন,—"এখন পঞ্চাননের স্পিন

মাপতে হবে। একটা D. C. টেবিল ফ্যান দরকার।"

আমরা দারুণ অবাক। তা জোগাড় হল। উঁচু টুলের ওপর টেবিল ফ্যান। পাঁচু বল করছে। বোলিং ক্রিজের পাশে রেগুলেটরের মত একটা জিনিসে হাত রেখে টেবিল ফ্যানের ঘুরন্ত ব্লেডের পেছন থেকে পাঁচুর দিকে চেয়ে ভূপেশবাবু স্যার দাঁড়িয়ে। পাঁচু তার ফাষ্ট বলে স্পিন দিচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে ঝোলা গোঁফের ফাঁকে হেসে স্যার বললেন,—"হুঁ, তা স্পিন তো মন্দ নয়। চোদ্দশো পঞ্চাশ। ওতেই হবে।"

আমরা বললুম,—"কি করে বোঝা গেল স্যার?"

স্যার বললেন—"ক্লাসে বুঝিয়ে দেব। স্ট্রোবোস্-কোপিক মেথড। যাকগে, কবে তোমাদের ম্যাচ?"

ঠিক দশদিন আর। স্যার বললেন,—"তোমরা কি ম্যাচ জিততে চাও?"

চাই না মানে? বললুম,—"স্যার, যদি ইনিংসে জিতি তবে শশীবাবু স্যার পোলাও মাংস খাওয়াবেন।"

শশীবাবু শশব্যস্তে বললেন,—"গেম্‌স্ ফাণ্ড থেকে, গেম্‌স্ ফাণ্ড থেকে।"

স্যার বললেন,—"আমাদের ইস্‌কুল যদি হোষ্ট্ হয় তবে আমাদের মাঠে আমাদের ব্যাটবল উইকেটে খেলা হবে তো?"

বললুম,—"হ্যাঁ স্যার, তবে ব্যাট ওরা আনতে পারে!"

স্যার গোঁফ চিবিয়ে চিন্তা করে বললেন,—"শশী, কুমার ভবতোষে ভাল স্পিনার আছে কিনা জান?"

শশীবাবুকে থামিয়ে আমরা সমস্বরে বললুম,—"ওদের চারটে পেসম্যান স্যার, স্পিনার নেই।"

ভূপেশবাবু স্বপ্ন স্বপ্ন চোখ করে বললেন,—পোলাও মাংস? আচ্ছা, দই মিষ্টি আমি খাওয়াবো। শশী, তোমার গেম্‌স্ ফাণ্ডের কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে।"

দিন তিনেক বাদে বীরু এসে বললে,—"পদ্ম বলছিল, হীরু কামারের কারখানা ঘরে ভূপেশবাবু স্যারকে দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যেবেলা।"

আমরা একটু অবাক হলুম। শশীবাবু, ভূপেশবাবু কেউ কিচ্ছু ভাঙ্গছেন না। শশীবাবু উল্টে পাঁচুকে রোজ কোচ করছেন আরও অফে সরে যেতে, বলছেন,—"ফুল পিচ বল মাথার ওপর দিয়ে ওড়াবার চেষ্টা করবি। ওরা যেন ব্যাটের ওপরে বল না পায়।" কিন্তু এ ষ্ট্রাটেজিতে লাভ কি?

খেলার দিন মাঠের ধারে শামিয়ানা খাটান হয়েছে। রোদ ঝলমল আকাশ। দুদিন বাদে সরস্বতী পূজো। বাতাসে যেন তারই গন্ধ। আমাদের মনে রহস্যের ছোঁয়া। দুজোড়া নতুন ব্যাট আর বগলে ছ'টা উইকেট নিয়ে মাঠে এসে হাজির হীরু কামার। উদো অবাক হয়ে বললে,—"এ আবার কি রহস্য?" ভূপেশবাবু স্যার নিজের কাঁধের ঝোলা থেকে বার করলেন চারটে লাল টুকটুকে বল।

পণ্ডিতমশাই নস্য নিয়ে বললেন,—"আজ কালবেলা আর বারবেলা দুটোই পড়ছে। খেলায় তোদের নির্ঘাৎ হার।"

আমরা ভ্যাবাচাকা খেতেই হেডমাষ্টার মশাই বললেন,—"সে কি পণ্ডিতমশাই, কুমার ভবতোষ ইনষ্টিটিউশনে কি কালবেলা পড়ছে না?"

পণ্ডিতমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন,—"যে ইস্‌কুলের নাম হ দিয়ে শুরু তাদের আজ মাঠে না নামাই উচিত।"

আর্ধেক ইস্কুল সঙ্গে নিয়ে কুমার ভবতোষ হৈ হৈ করে এসে পড়ল। মণ্টু ঘোষাল আমাদের পাড়ারই ছেলে। চেঁচিয়ে বললে,—"ফাষ্ট ডেলিভারিতেই উইকেট তিন টুকরো করব, তৈরি থাকিস উদো।"

আমরা কথাটি বলছি না। ভূপেশবাবু শামিয়ানার নিচে দাঁড়িয়ে গোঁফের দুপাশ চিবোচ্ছেন। শশীবাবু পাঁচুকে ফের বললেন,—"সব সময়ে ওয়াইড অফ্ দি মার্ক বল করবি, মাথার ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবি। ব্যাটে বলে যেন না হয়। ফিল্ড প্লেসিং ছড়িয়ে দিবি।"

টসে আমরাই জিতলুম। অভ্যাসবশত ব্যাট করতে নামলুম। উদো আর পদ্ম ওপ্ন্ করবে। উদো লেগ ষ্টাম্প্ গার্ড নিলে। আম্পায়ার দুজন বেনেপুকুর আর সেণ্ট্রাল ইংলিশ স্কুলের স্যারেরা। শুরুতেই মণ্টু ঘোষাল দৈত্যের মত ছুটে এসে দারুণ ইনসুইংগার ছাড়লে। শর্ট অফ লেংথ। ব্যাকফুটে ডিফেনসিভ খেললে উদো। পরের ডেলিভারি আরও ফাষ্ট—উদো মার্ভেলাসলি গ্রাউণ্ডে চেপে দিল। খেলা পুরোদমে আরম্ভ হয়ে গেল। ফার্ষ্ট উইকেট পড়ল ১৭য়,—পদ্ম। সেকেণ্ড তেত্রিশে,—উদো। থার্ড ছত্রিশে—বীরু। ফোর্থ সেই ছত্রিশেই—আমি। লাঞ্চের আগেই আটটা উইকেট পড়ে গেল, স্কোর আটাত্তর।

কুমার ভবতোষের সাপোর্টারদের চিৎকারে কান পাতা যায় না।

লাঞ্চ ব্রেকে পণ্ডিতমশাই গলা চড়িয়ে বললেন—"এইবার বারবেলা পড়ল।" লাঞ্চের আলুর দম পাঁউরুটি ঘাস সেদ্ধর মত লাগতে লাগল। কই, কিছুই তো অপ্রত্যাশিত ঘটছে না! তবে আমরা কোন রহস্যের জন্যে অপেক্ষা করছি?

অবশ্য শেষ দু উইকেটে অদ্ভুত খেললে পাঁচু আর আমাদের উইকেট কীপার সুকুমার। স্কোর দাঁড়াল অল ডাউন ১৭৮। টি ব্রেকের পর তিনটেয় কুমার ভবতোষ প্যাড্ ট্যাড্ পরে মাঠে নামল। ওদের ওপ্নারের ইস্কুল লীগে অ্যাভারেজ তিরানব্বুই, মোট তিনটে সেঞ্চুরি। আমাদের হাঁকড়িয়ে কি আজ ডবল সেঞ্চুরি করবে? এই জন্যই কি হীরু কামারের ব্যাট বগলে মাঠে ঢোকা?

পাঁচু কনভেনশনাল ফিল্ড্ সাজালে। শর্ট লেগ, ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগ, স্কোয়্যার লেগ, শর্ট স্কোয়ার লেগ, সিলি মিড অন, একটা স্লিপ, একটা কভার। মণ্টু ঘোষাল দাঁত বার করে ওপ্ন্ করতে এল। গুণে গুণে পোনেরো পা ছুটে এসে পাঁচু বল করলে—তার সেই বিখ্যাত ফাষ্ট স্পিন। বল অনেক অফ্ দিয়ে সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে যাচ্ছে, মণ্টু ছেড়ে দেবে বলে তৈরি, হঠাৎ—এ আবার কি? বলটা ধনুকের মত বাঁক নিয়ে পাঁচফুট ভেতরে ঢুকে নট নড়ন চড়ন ব্যাটকে পাশ কাটিয়ে অফ ষ্টাম্পকে শুইয়ে দিলে। মণ্টু হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাঠে যে চিৎকার উঠল তার ধারণা তোরা করতে পারবি না।

মণ্টু হোঁচট খেতে খেতে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেল। ওয়ান ডাউন ব্যাট্স্ম্যান ফেস করতে এল পাঁচুর নেক্সট্ বল। আবার অফের দিকে অনেকটা বাইরে দিয়ে এল বল। ব্যাট্স্ম্যান ব্যাট তুলেও ছেড়ে দিলে, বেরিয়ে যাবে মনে করে। সুকুমার বাই বাঁচাতে ডাইনে লাফিয়ে এল। কিন্তু এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বল ঠিক যেন ইউ টার্ন নিয়ে নিমেষে পেছন দিক থেকে উইকেটে ঢুঁ মারল। আশ্চর্য ভুতুড়ে ব্যাপার। দু বলে শূণ্য রানে দু উইকেট।

মাঠে পিনড্রপ সাইলেন্স। পাঁচু নিজেও কম অবাক হয় নি। তিন নম্বর ব্যাট্‌স্‌ম্যান পাঁচুর থার্ড বল হাঁকড়াবার জন্যে ক্রিজ্‌ ছেড়ে বেরিয়ে এসেও ব্যাটে ঠেকাতে পারলে না। বল তার ব্যাটের পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে এসে হঠাৎ ৬০ ডিগ্রীতে মোড় নিয়ে সটান অফ ষ্টাম্প্‌ উপড়ে দিলে। চার নম্বরের ব্যাট্‌স্‌ম্যানের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে দারুণ ওভারপিচ্‌ বল হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে হরাইজন্ট্যাল লাইন ছেড়ে ভার্টিক্যাল দিকে টুপুস্‌ করে ঠিক উইকেটের মাথায় বেলের ওপরে পড়ল। পাঁচ ছয়ের বেলাও একই গল্প।

পাঁচুর ফিগার হল, ১ ওভার ১ মেডেন, শূন্য রান, ছয় উইকেট। উদোর বলে নেক্‌স্‌ট্‌ ওভারে ওরা মোট দুটো বাউণ্ডারী নিয়ে করলে ১২। পাঁচুর দ্বিতীয় ওভারেই খেল প্রায় খতম। ঘড়িতে সাড়ে তিনটে।

পাঁচুর ফোর্থ বল ফেস করবার জন্যে দাঁড়িয়েছে ওদের লাষ্ট পেয়ারের জুটি। ছেলেটার নাম মনে আছে, কেবলরাম গুঁই। বেচারা সবে অ্যানিমিয়াতে ভুগে উঠেছে, প্যাভিলিয়নেও টনিকের বোতল নিয়ে এসেছে। পাঁচুর ১০০ কিলোমিটার স্পীডের স্পিন বল ফেস করবে না বলে অফের বল ছেড়ে বেচারা লেগের দিকে সরে গেছে। বলটা ছুটে এসে যেন ওকে দেখে হঠাৎ আকাশেই থেমে গিয়ে রাইট টার্ন করে স্পিন খেতে খেতেই লাগল ওর মাথায়। বেচারি চৌচাপটে শুয়ে পড়তেই হিট উইকেট হয়ে গেল। পাঁচুর নটা বল উইকেট ওপড়াবার পর শেষ বলটা হঠাৎ কেবলরামের গায়ে লাগল কেন বুঝলুম না। কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। অফের উইকেটটা পটাং করে নিজে থেকেই উপ্‌ড়ে এসে কেবলরামের চিৎপটাং পেটের ওপরে সেঁটে গেল। মহাভয়ে চোখ গোল করে ও ষাঁড়ের মত চিৎকার করে ঐ অবস্থায় উঠে প্যাভিলিয়নে দৌড়ল। টেনে ফেলে দিলেও ঐ উইকেট ফের জ্যান্ত হয়ে ওর পেছনে সেঁটে রইল। ভূত দেখার মত করে পাঁচুর দিকে চেয়ে থেকে কুমার ভবতোষ ইনষ্টিটিউশন ছাত্র টিচার সমেত হুড়মুড় করে হাওয়া। নেক্‌স্‌ট ইনিংস আর হল না। হ্যাঁ সেই হল আমার দেখা ক্রিকেট। চলিরে আজ—" বলেই বঙ্কুবাবু উঠে পড়লেন। তপেশ হাঁ হাঁ করে উঠে এক ধাক্কায় ফের ওঁকে বসিয়ে দিলে। বললে,—"ইয়ারকি নাকি? রহস্যটা এক্‌স্‌প্লেন না করে তুমি ওঠো তো দেখি!"

বঙ্কুবাবু বললেন,—"রহস্য ছিল উইকেটের মধ্যে অর্ধেক আর পাঁচুর স্পিনের মধ্যে অর্ধেক। অফের উইকেটটা দণ্ড চুম্বক, হীরু কামার গড়েছিল। ভূপেশবাবু স্যারের কৌশল। বলগুলোর ভেতরে একটা করে ধাতুর পটি দেওয়া ছিল। সে জিনিস আমাদের স্যারের জিনিয়াস দিয়ে গড়া, আজকাল তোরা তাকে semiconductor বলিস। পাঁচুর স্পীডে হাওয়ার ঘর্ষণে বলটা গরম হচ্ছিল। প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন ঐ semiconductor band থেকে ভেসে উঠছিল। পাঁচুর দেওয়া সাংঘাতিক স্পিনের জন্যে সেই ঘূর্ণ্যমান spinning ইলেকট্রণগুলো কারেন্টবাহী কয়েলের মত কাজ করছিল, ফলে বলটাও তার ফ্লাইটে হয়ে যাচ্ছিল চুম্বক। তাই হবে, বই পড়ে দেখিস। আর ঐ চুম্বককে উইকেটের দণ্ড চুম্বক টেনে নিচ্ছিল।

বিশু হাঁ করে থেকে বললে,—"তাহলে ঐ শেষ ব্যাট্‌স্‌ম্যান কেবলরামের গায়ে উইকেট সেঁটে গেল কেন?"

বঙ্কুবাবু উঠতে উঠতে মুচ্‌কি হেসে বললেন,—"বেচারা আয়রণ টনিক খেয়ে খেয়ে সারা শরীরের রক্ত লোহার আয়নে ভরে ফেলেছিল। তাই বলি, বেশি আয়রণ টনিক কক্ষনো খাসনি।

বিমলেন্দু মিত্র

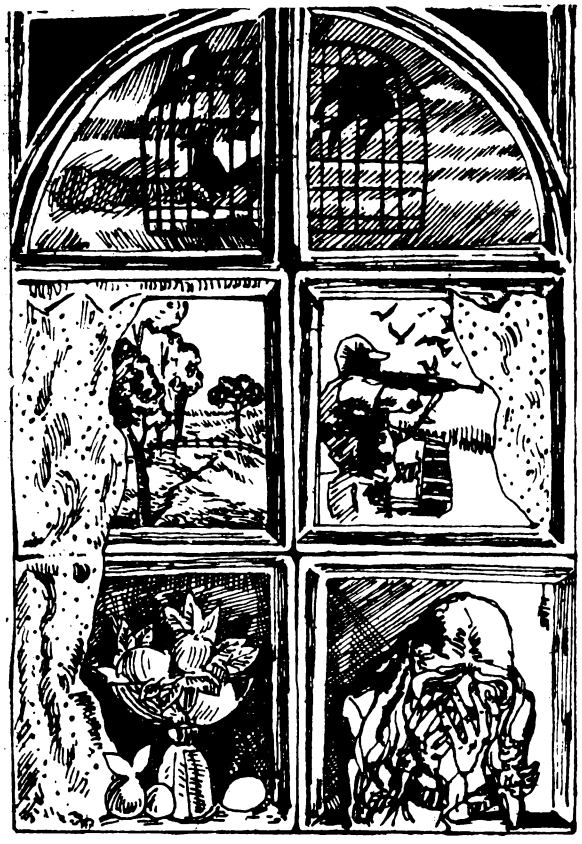

মনের জানলা

চিন্তার ছাপ!

—কি ব্যাপার? কি নিয়ে এমন গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা চলছে?

চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকাতেই সরমাদিকে দেখতে পেল অন্তু। টেবিলের একপাশে হাতব্যাগটা রেখে চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে সরমাদি বললেন—সামনে যদিও মেনসুরেসনের চ্যাপটারটা খোলা দেখতে পাচ্ছি, তবু হলফ করে বলতে পারি তোমার মন এখন অন্য জায়গায়। ভাবছ বোধ হয়—পাকিস্তানের কাছে এবার ভারতকে কি নাকালটাই না হতে হচ্ছে! এশিয়ান গেম্‌সের সময় হকিতে সাতগোল খাওয়ার পর—ক্রিকেটেও পাকিস্তানের কাছে রাবার খোয়াতে হ'ল আমাদের!

অন্তু বলল—ধ্যাৎ! মোটেই না।

সরমাদি মুচ্‌কি হাসলেন, বললেন—বেশ না হয় খেলার কথা ভাবছিলে না; কিন্তু আমি যখন ঘরে ঢুকলাম, তোমার চোখ বলে দিল, তুমি নিবিষ্ট মনে একটা কিছু নিয়ে চিন্তা করছ। অঙ্কের বই টেবিলের উপর খোলা থাকলেও, পেনের খাপটা দেখছি বন্ধ। সুতরাং তোমার চিন্তার বিষয় যে অন্য কিছু.....

সরমাদি কথা শেষ করার আগেই অন্তু বলল—কে কেমন চিন্তা করছে তা কি তার চোখ দেখে বোঝা যায় না কি?

—যায় বৈ কি! সরমাদি শুরু করেন। —কিছু-দিন আগে এ ব্যাপারে কিছু লোকের উপর একটা পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। যাদের উপর পরীক্ষা চলানো হয় তাদের পরপর প্রত্যেককে একটা ঘরে বসিয়ে কতকগুলি ছবি দেখানো হয়। প্রোজেক্টারের সাহায্যে দেওয়ালের স্ক্রীনে যখন একটার পর একটা ছবি ফেলা হচ্ছিল, তখন মুভী ক্যামেরার সাহায্যে দর্শকদের অজান্তেই তাদের চোখের নড়াচড়ার ছবিও তুলে নেওয়া হয়েছিল অন্ধকারের মধ্যে। অন্ধকারে ছবি তোলার জন্য একটা আয়না আর ইনফ্রারেড ল্যাম্প—বাংলায় যাকে বলে লাল—উজানী আলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। সে যাক্ গে, পরে দেখা গেল—বিশেষ বিশেষ ছবি স্ক্রীনে দেখানোর সাথে সাথে দর্শকদের 'তারারন্ধ্র' বা সোজা কথায় 'চোখের মণির আকার আকৃতিও পাল্টেছে। যেমন যখন বাচ্চাদের ছবি দেখানো হচ্ছিল—তখন প্রায় সব মহিলা দর্শকেরই চোখের মণিগুলি আকারে বড় হয়েছে অর্থাৎ আমরা যাকে বলি চোখ বড় বড় করে দেখা! মনের কথাটা যে চোখের মধ্যে দিয়ে টের পাওয়া যায়—এটাই তো তার প্রমাণ।

অন্তু মাথা নেড়ে বলল—কিন্তু সরমাদি, বাচ্চাদের ছবি দেখার সময় মহিলাদের চোখ বড় বড় হলেই কি প্রমাণ হয়—তারা সবাই ঐ সময় বাচ্চাদের নিয়েই চিন্তা শুরু করে দিচ্ছেন?

—না তা হয় না। তবে তোমাকে আরও একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা বলতে পারি—যাতে চিন্তাভাবনার

সঙ্গে তারারন্ধ্রের আকৃতির সম্পর্ক অনেক স্পষ্ট ভাবে ধরতে পারা গেছে। যে এক্সপেরিমেন্টের কথা বলছি, তাতে কিছু লোককে কয়েকটা বুদ্ধির অঙ্কের সমাধান করতে বলা হয়। দেখা গেল—অঙ্কটা যেই দেওয়া হচ্ছে লোকেদের চোখের মণিও অমনি বড় হতে শুরু করছে—এবং যতই তারা অঙ্কটা নিয়ে চিন্তা করছে, অঙ্কের সমাধানের দিকে এগোচ্ছে—ততই তাদের চোখের মণি আরও বড় হচ্ছে।

অন্তু চুপচাপ শুনছিল, সরমাদি বললেন—তবে হ্যাঁ, চোখের মণি ছোট-বড় হওয়া ছাড়াও—আমাদের শরীরের অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও চিন্তার ছাপ পড়ে। এখন থেকে বছর পঞ্চাশ আগে 'জ্যাকব্‌সন' নামে এক ভদ্রলোক একটা মজার পরীক্ষা করেছিলেন। একজন লোককে তিনি একটা হাতুড়ি দিয়ে দেওয়ালের গায়ে দু'টো পেরেক লাগাতে বললেন। পেরেক দু'টো লাগানোর সময় লোকটার হাতের পেশীর যতটা নড়াচড়া হল—সেটা রেকর্ড করে রাখা হ'ল। পরে, লোকটিকে দেওয়ালের গায়ে পেরেক লাগানোর ব্যাপারটা চিন্তা করতে বলা হ'ল। দেখা গেল চিন্তার সময়ও লোকটির হাতের পেশীর একইভাবে নড়াচড়া হচ্ছে—যেন সত্যি সত্যিই সে তখন পেরেক লাগাচ্ছে।

চিন্তার সময় আমাদের মাংসপেশীর নড়াচড়া হবেই এমন কথাটা ঐ এক্সপেরিমেন্টের পরও অনেকেই অবশ্য মেনে নিতে পারেন নি। ১৯৪৭ সালে এ ব্যাপারটা নিয়ে আবার নতুন করে পরীক্ষা চালানো হ'ল। বছর চৌত্রিশ বয়সের এক স্বাস্থ্যবান ডাক্তারকে 'ডি-টিউবো-কুরেরিন' নামে একটা ওষুধ খাইয়ে শুইয়ে রাখা হ'ল। ওষুধটার কাজ হ'ল—সারা শরীরের প্রায় যাবতীয় মাংস-পেশীকে তা কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল করে দেয়, যদিও মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে কোনও রকম ব্যাঘাত ঘটে না। ঘণ্টা চারেক ধরে প্যারালিসিসের রোগীর মত শুয়ে থাকার পর বিশেষ প্রক্রিয়ায় যখন ডাক্তারটিকে আবার সুস্থ করে তোলা হ'ল- তিনি জানালেন—সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থাতেও তিনি স্বাভাবিক রকমের চিন্তা ভাবনা করেছেন—এবং তা করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় নি।

আসলে, চিন্তা ভাবনার সময় যে আমাদের শরীরে পেশীর নড়াচড়ার কিছু ভূমিকা আছেই তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তুমিই ভেবে দেখ না, কোনও বন্ধুর সঙ্গে হয়তো রাগারাগি হয়েছে—হয়তো তার সঙ্গে মারপিটও করেছো। ঐ মারপিটের কথাটাই চিন্তা করতে গিয়ে পরে হয়তো আন্‌মনেই বাতাসে ঘুসি মারছ। এরকম তো হামেশাই হয়। তবে শূন্যে ঘুসি না মেরে তুমি মার-পিটের কথাটা চিন্তা করতেই পারবে না—এমন কথা বলা যায় না।

—আপনার কথা শুনতে শুনতে মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে বড়মামার হঠাৎ বুকে ব্যথা শুরু হ'ল। ডাক্তারবাবু বললেন, অফিসের চিন্তা টিন্তা বন্ধ রেখে বাড়ীতে শুয়ে গল্পের বই পড়ুন। হার্টটাকে সামলে রাখতে হলে মনটাকে চিন্তামুক্ত করতে হবে।

অন্তুর কথায় সরমাদি সায় দিলেন, বললেন—চিন্তা করার সময় আমাদের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কোনও সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেই—আমাদের হৃদস্পন্দনের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে এবং সমস্যার সমাধানের মুহূর্তে ঐ সংখ্যাটা হয় সবচেয়ে বেশী। চোখ, শরীরের পেশী বা হৃদযন্ত্র—এগুলো ছাড়াও—চিন্তার সময়ে অনেকেই যে বিড়বিড় করে তা বলে সেটাতো নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। সাধু বাংলায় এটাকে বলা যেতে পারে—'উচ্চস্বরে চিন্তা!'

সরমাদি এবার ব্যাগ থেকে পেনটা বে'র করলেন, তারপর অন্তুর হোমটাস্কের খাতাগুলো টেনে নিতে নিতে বললেন—শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর 'চিন্তার' ছাপ পড়ে কি পড়ে না তার থেকেও বড় কথা হ'ল—মানুষে মানুষে চিন্তার এত প্রভেদ কেন? একজন মানসিক রোগী চিন্তা করে—এই বুঝি তার ঘরের ছাদটা ভেঙ্গে পড়ল। একজন সুস্থ লোক এমন চিন্তা কখনই করতে পারে না। আবার সমুদ্রের জল তো নীল দেখে সকলেই, তবু কেন বিজ্ঞানী রমনেরই মাথায় আসে আলোর এক বিশেষ ধর্মের কথা—যার জন্য আকাশ কিংবা সমুদ্রকে নীল দেখি আমরা? ক্লাসের পড়াগুলো হয়ে যাক্—তারপর বরং এই প্রশ্নগুলোর উপর চিন্তা করা যাবে, কি বল?

সরমাদি খাতায় পাতাগুলো উল্টোতে শুরু করলেন।

* অমিত চক্রবর্তী

বিশ্বজুড়ে বিচিত্র প্রাণ

কৃষ্ণা ঘোষাল

গায়ের রং দেখে যেমন এক দেশ থেকে অন্য দেশের লোককে আলাদা করা যায়, তেমনি সামুদ্রিক প্রাণীদের রঙ্ বলে দেয় — সাগরের কোন তলার বাসিন্দা তারা। সাগরজলের উপরের স্তরের মাছেদের রঙ্ সাধারণতঃ ধূসর, সবুজ অথবা নীল। গভীর জলের বেশির ভাগ সামুদ্রিক মাছদেরই গায়ের রং নেই। বুঝতেই পারছ, এই বর্ণহীনতা বা অস্বচ্ছতাই হ'ল গভীরজলের বাসিন্দাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার। জেলি-ফিসের কতকগুলি প্রজাতি জলের উপরের স্তরে স্বচ্ছ হলেও — সাগরের ৩০০ মিটার নীচে সেগুলিকেই আবার রং পাল্টে বাদামী! আসলে সাগরের ঠিক ঐ গভীরতায় বহু মাছই নানা ধরনের বাদামী রঙের — লাল, গাঢ় বেগুনী বা কাল রঙের ছোপওয়ালা। সুতরাং জেলি-ফিসের বাদামী রঙ্ও তাকে মিশিয়ে দেয় আর পাঁচটা মাছের সঙ্গে।

চিংড়ীদের ব্যাপারটা অবশ্য অন্যরকম। জলের উপরের স্তরে যে চিংড়ী বর্ণহীন, বেশ কয়েকশো বা হাজারখানেক মিটার নীচে গিয়ে তারই রঙ্ হয়ে যায় লাল বা বেগুনী। সাগরের হাজার-দু'হাজার মিটার জলের তলায় যেখানে প্রায় যাবতীয় সামুদ্রিক প্রাণীই বর্ণহীন — ঐ অন্ধকারের রাজত্বে যেখানে কোনও রঙ্কেই আলাদা করে চিনতে পারা যায় না, সেখানে চিংড়ীমাছদের লাল বা বেগুনী রঙের প্রয়োজনটা কোথায় তা এখনও ঠিক জানা নেই।

সাগরজলের চিংড়ীরা যেমন নিজেদের রঙ্ পাল্টানোয় ওস্তাদ, তেমনি বিদ্‌ঘুটে বিকট আওয়াজ করে আশপাশের প্রাণীদের ব্যতিব্যস্ত করতেও এদের জুড়ি নেই! দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় একবার এক আমেরিকান ডুবো জাহাজ বোর্ণিও দ্বীপের কাছাকাছি ম্যাকাসার প্রণালী দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ জাহাজের হাইড্রোফোনে ধরা পড়ল প্রচণ্ড আওয়াজ। জাহাজের ক্যাপ্টেন ভাবলেন, নিশ্চয়ই জাপানীরা নতুন ধরনের মাইন বসিয়েছে জলের তলায়; একটুও দেরী না করে তিনি জাহাজের গতিপথ পাল্টে দে চম্পট! খানিকক্ষণ পরে একই ঘটনা ঘটল। একটা জাপানী ডুবোজাহাজের ক্ষেত্রে। জাপানীরাও ভাবল — আমেরি-কানরাই বুঝি মাইন বসিয়েছে ওখানে। পরে জানা গেল,

যে আওয়াজে ডুবোজাহাজের লোকজন চমকে গিয়েছিল — তা করছিল এক জাতের চিংড়ীমাছ — যারা এমনিতে শান্তশিষ্ট স্বভাবের। জাপানী এক জীববিজ্ঞানী দেখেছেন, ওই চিংড়ীগুলোর চ্যাঁচামেচি মাঝে মাঝে এতই জোরালো হয় যে জাপানী দ্বীপগুলোর অধিবাসীরাও তাদের বাড়ীতে বসেও সে আওয়াজে চমকে ওঠে।

সামুদ্রিক মাছেদের আওয়াজের ব্যাপারটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। রোমান যুগে শব্দ করা মাছেদের বলা হত 'কাক', গ্রীকরা বলত ব্যাঙের মত ডাক ছাড়া মাছ! ভূমধ্যসাগরের মাছ ড্রামফিসের আওয়াজ কিন্তু বেশ সুরেলা। চার্লস ডারউইন একবার দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে বেশ জোরে ফট্‌ফট্‌ শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। আওয়াজটা করছিল 'আর্মাডো' নামে এক ধরনের বিরাটাকার মাছ।

এক এক রকম মাছের এক এক রকম আওয়াজ! স্প্র্যাট্‌' — মাছেরা খাওয়া দাওয়ার সময় এক রকম খস্‌খস্‌ আওয়াজ করে যা অনেকটা বাতাসে পাতা নড়ার শব্দের মত। খাবার গেলার সময় 'কার্প' মাছ আওয়াজ করে ঠোঁট বন্ধ করে। সার্ডিন'দের আওয়াজের সঙ্গে মিল রয়েছে ছোট ছোট ঢেউএর মৃদু শব্দের সঙ্গে।

যেসব সামুদ্রিক মাছেরা সবচেয়ে বেশী আওয়াজ করে তাদের একটা হ'ল 'গার্নার্ড'! সম্ভবতঃ শত্রুদের দূরে রাখার জন্য এরা সবসময়ই কর্কশ আওয়াজ করে। যখন কোনও মাছ ধরা জাহাজের উপর জাল বোঝাই গার্নার্ড মাছ ঢালা হয় তখন মাছগুলো ভয়ানক গোলমাল করে। অ্যাকুরিয়ামে রাখা কোন গার্নার্ড মাছের গায়ে আলতো করে হাত দিলে সেটা মৃদু মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ করবে, কিন্তু বেশী বিরক্ত করলেই মাছই আবার ক্ষেপে গিয়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়বে!

একমাত্র বিশেষ কোন কারণ থাকলে তবেই মাছেরা শব্দ করে। সাধারণতঃ কোনও জাহাজ কাছে এলে মাছেরা চুপ করে থাকে। কোনও কোনও মাছ সূর্যাস্তের আগে আওয়াজ করে না। আবার কোনও মাছের অ্যাকুরিয়ামে কিছু ফেললেই তারা চিল-চীৎকার লাগায়। তবে শত্রু কাছাকাছি এলে — প্রায় সব মাছেরাই গোল-মাল শুরু করে।

চিংড়ীমাছের আওয়াজের কথা বলছিলাম। কোনও কোনও চিংড়ীর আওয়াজ অনেকটা উনুনের কড়াইতে তেল ফোটার চট্‌ চট্‌ শব্দের মত। এই ধরনের চিংড়ীর বড় দাঁড়াগুলিতে যাকে একটা ছোট্ট ফাঁপা জায়গা যেখান থেকে ছিপি খোলার মত ফট্‌ফট্‌ শব্দ একটানা বেরিয়ে আসে — কোনও কোনও জায়গায় এই শব্দ দিনে রাতে কখনই থামে না। এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চিংড়ীমাছ ফোয়ারার মত ফিন্‌কি দিয়ে জলও ছিটোয় — শত্রুকে আক্রমণ বা শত্রু থেকে আত্মরক্ষার উপায় এটা। গলদা চিংড়ী ভয় পেলে বা বিরক্ত হলে তাদের নিজেদের খোলার গায়ে দাঁড়া ঘষে জোরে জোরে মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ করে। কাঁকড়াও বিপদে পড়লে দাঁড়া দিয়ে ফট্‌ফট্‌ শব্দ করে ঠিক একইভাবে।

উত্তর আমেরিকার উপকূলের কাছাকাছি পাওয়া যায় 'ফ্রোকার' নামে এক জাতীয় ছোট্ট মাছ। ঝিঁঝিঁ পোকার মত রাত্রিবেলা একটানা আওয়াজ করে এরা। একহাজার কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজন হয় যাদের — 'মুন' নামে সেই দানব মাছেরা জল থেকে গলা বাড়িয়ে দাঁত ঘসে শব্দ করে। 'পাফারে'রা শব্দ করে তাদের চোয়াল ঘষে। ক্যাস্পিয়ান সাগরে পাওয়া যায় 'বেলুগা' নামে এক ধরনের মাছ। জেলেদের জালে ধরা পড়ার পর এদের আওয়াজটা শোনায় ঠিক দীর্ঘশ্বাসের মত!

তিমি, বা শুশুক — এই বড় আকারের সামুদ্রিক স্তন্য-পায়ীদের গুঞ্জনতো হামেশাই শুনতে পায় জাহাজের নাবিকরা। কখনও কখনও অবশ্য স্তন্যপায়ীদের আওয়াজটা শোনায় গর্জনের মত — শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নাক দিয়ে হাওয়া বের করে এই আওয়াজ করে তারা। অনেক সময় তিমি মাছেরাও তাদের চোয়ালের পাটি দুটো ঘষে

জোরালো শব্দ করে থাকে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা — তিমি মাছেদের শুধু যে শব্দ করার ক্ষমতাই আছে তাই নয়, এদের ভাষাও আছে। নানা বিচিত্র আওয়াজে তারা একে অপরকে ডাকে, দুঃখ পেলে শব্দ করে কাঁদে, এমনকি মনের স্ফূর্তিতে গানও গায় ওরা। সেই গানের শব্দ দিয়ে গ্রামাফোন রেকর্ডও বেরিয়েছে আমেরিকায় — শুনলে পরে তাক্ লেগে যায়!

ধাঁধা

চার অক্ষরে নামটি আমার রঙের বাহার আছে,
প্রথম দুটির হাত জোড়া ভাই, পরের দুটির কাছে।
ছোটবেলায় পায়ের বাহার, গুণতে লাগে ভয়
বাড়লে বয়স সেসব লোপাট, থাকবে বাকি ছয়!
নই কো পাখী, তবুও ভাই, আছে আমার ডানা
একটু ভেবে দেখলে পরে নামটি যাবে জানা।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর : ভাইরাস

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম :

সৈয়দ আব্দুল ওয়াসিম, বর্ধমান ; দিব্যেন্দু পাণিগ্রাহী, কলিকাতা। শ্যামল দাস, অনুপম দত্ত বণিক, অনিতা দাস ও চন্দন দাস, গোবরডাঙা ; মৃণালকান্তি দত্ত, শৈবালকৃষ্ণ দত্ত, তমালকান্তি দত্ত, নিখিল ভট্টাচার্য্য, দীপা ব্রহ্ম ও সঙ্গীতা কায়েত, গোবরডাঙা ; স্নেহাশীস সেন, কাঁচরাপাড়া ; বন্দনা সেন ও উদয়ন চক্রবর্তী, শিবপুর ; সৌমেন বিশ্বাস, মেদিনীপুর, রীতা দেবশর্মা, দেয়াড়াপাড়া নবদ্বীপ, অভিজিৎ দে, বাঘা যতীন রোড, শাশ্বতী বিশ্বাস, সুভাষনগর, বনগাঁ।

জানো কি ?

(১) একটি শিশুর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুরু হয় কখন্ থেকে ?

(ক) জন্মের মুহূর্তে, (খ) মাতৃজঠরে থাকার সময় থেকে, (গ) জন্মের ৩০ সেকেণ্ড পরে।

(২) প্রতি স্বাভাবিক শ্বাসগ্রহণে কতটা বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে ?

(ক) ৫০০ মিলিলিটার, (খ) ৩,৩০০ মিলিলিটার, (গ) ২০০ মিলিলিটার।

(৩) পুরণো তৈলচিত্রের রঙ উদ্ধারের জন্য কোন্ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয় ?

(ক) হাইড্রোজেন পারক্সাইড, (খ) ওজোন, (গ) নাইট্রিক অ্যাসিড।

(৪) অ্যাকোয়া রিজিয়া কি কাজে ব্যবহৃত হয় ?

(ক) দ্রাবক হিসেবে, (খ) বিস্ফোরক তৈরীর কাজে, (গ) বিরঞ্জক হিসেবে।

(৫) কোন্ নদীতে একটাও মাছ নেই ?

(ক) টেমস, (খ) জর্ডন, (গ) নীলনদ।

(৬) কোন্ মাছ ডিম পাড়ে না ?

(ক) ইলেক্ট্রিক রে, (খ) রুইমাছ, (গ) হাঙর।

(৭) ভারতের প্রথম রকেট কবে উৎক্ষিপ্ত হয় ?

(ক) ২১শে নভেম্বর, ১৯৬৩,
(খ) ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩।
(গ) ২১শে নভেম্বর, ১৯৬৫,

জানো কি'র উত্তর : —

১) খ ; ২) ক ; ৩) ক ; ৪) ক ;
৫) খ ; ৬) গ ; ৭) ক।

Glue Chem brings a New Sensation in Industrial Adhesive World

USER
- CARTON MAKERS
- PHARMACEUTICALS
- BREWERIES
- SOAP INDUSTRIES
- OIL INDUSTRIES
- DISTILLERIES
- CIGARETTE MFGRS.
- BISCUIT FACTORIES
- COSMETICS MFGRS.
- TEA IND.
- DRY & BOTTLED FOOD MFGRS.
- JUTE IND.
- BOOK BINDERS
- LEATHER IND.
- CORRUGATION IND.

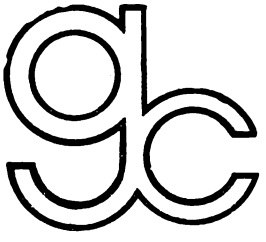

GLUE CHEM

MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL ADHESIVES

2, Church Lane, 2nd Floor,
Calcutta-700 001

Phones : 232726, 463812, 621677

BIJNAN MELA FEBRUARY 1983 Rs. 2.25

Post Regd. WB/SC—200 Vol. 3 No. 2 Regn. No. R N. 37306/81

হাতীবাগান জংশন, ফোন নং ৫৫-৮১২৯

Published by Ashim Chakraborty from 173, Ashokgarh, Cal.-700035 and Printed by Satyanarayan Press, 1, Ramaprasad Roy Lane, Cal.-700006 and Cover Printed by Perfect Press, 32A, Patuatola Lane, Cal.-9